আলাপ (Alaap)

শুভ নববর্ষ

১৪৩২

"Bengali Association of Atlantic Canada's (BAAC) first ever E-Magazine - ALAAP"

In a world overflowing with content, especially "short content", you might ask why to start a magazine? The answer is very simple, we started this magazine to carve out a space where voices could be heard, where stories could be told, where creativity could be showcased.

At it's heart this magazine was born out of BAAC's passion and vision to uphold our rich culture and heritage. Our culture lives in our language, traditions, food, music, rituals and in our everyday lives. But in our fast-paced lives, at times it takes a backseat. This magazine is our way to reclaiming that space. We wanted to create a platform that honours the depth and diversity of our cultural heritage. And what better way than to invite the voices of the community members itself, to express themselves, via articles, paintings, pictures etc. We are here to document it all.

But most importantly, this magazine has been introduced for YOU – the reader. We all have grown up in the "non-digital", sans Artificial Intelligence era; books being our company at some point of time. We all have discussed, debated and cherished, novels, authors, writers, poets and artists over a cup of tea or coffee. We have all shared dog-eared books, underlined passages, argued over metaphors. Well, it's time we relive those days, those moments yet again, to slow down in this fast world, to return to meaningful conversations, to story telling sessions. This magazine is an invitation to gather those bits, A LITERARY ADDA ALL OVER AGAIN, because EVERY VOICE MATTERS. This magazine is not just content but a connection, it's a celebration. It's all about your contribution in keeping the flame alive.

Last but not the least, publishing this magazine would not have been possible without you. A heartfelt thanks to each one of you for dedicating your time, showcasing your talent and contributing to the magazine.
So, welcome to this journey through traditions and identity. This is just the beginning!!
Happy Reading!!

P.S. We will have a second edition during Durga Puja. We look forward to your support and co-operation in the future

আসুন, একটু আলাপ করে নিই

Bengali Association of Atlantic Canada (BAAC) is a socio-cultural, non-profit organization built on the core values of Culture, Inclusiveness and Harmony. Our primary endeavor is to organize cultural, social and recreational events to foster the relationship and co-operation among the Bengalis in the Atlantic Canada region and provide a welcoming atmosphere to build strong community connections and celebrate the rich Bengali heritage.

What makes BAAC unique is its approach. We are not just for Bengalis. We welcome members from other communities with equal warmth. Anyone who inclines to know and connect with the rich Bengali culture is welcome to join us. We believe that true strength is to appreciate diversity while maintaining the essence of the Bengali traditions and the Bengali language.

BAAC was established in December 2024. Within this short period of 5 months, BAAC has hosted 3 events, Saraswati Puja in February, International Women's Day in March and Aarohi – A Baisakhi Mahotsav in April. Each of these events was carried out in a well-organized manner with substantial footfall from the community. BAAC has received many appreciations for the quality of food provided, standard of cultural events and the overall ambience.

Meet The Teams:

BAAC Crew – Event management team
BAAC Chefs – Swade Ahlade
BAAC Decorations – Shajano Gochano
BAAC Muzomania – Shurobitan
BAAC Stage Crew – Shobdo Aalo
BAAC Digitals – Chitrogrohon
BAAC Steppers – Nrityo
BAAC Creative Ensemble
BAAC Drama Club
BAAC EMagazine
BAAC Namastute – Pujo Path

Upcoming Events:

1. Picnic – Date to be announced
2. Durga Puja – October 3rd to October 5th
3. Christmas and New Year Bash – Date to be announced

BAAC's success would not have been possible without the support and engagement from all of you. We want to thank you from the bottom of our hearts and we will always stay humble for the love and support. We want to extend our gratitude to all who have contributed to the various BAAC teams. May all the celebrations strengthen the bonds of our community and friendship.

Best wishes!
BAAC team

আলাপ (Alaap)

Contents (সূচীপত্র)

Pg 7   ব্যাঙ ও বাঙালি   (জীবন রায়)
ব্যাঙ ও বাঙালি শব্দের ভিতর অনেক মিল আছে।.......

Pg 10 The Leafy Color parade (Poulomi)
One fine day in breezy..........

Pg 12 Blue Lock: Rivals (Chitraksh Chowdhary)
Blue Lock: Rivals is a popular game .....

Pg 13   বারো মাসে তেরো পার্বণ (জীবন রায়)
বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বাংলা.......

Pg 14 Battles We Fight (Shrabanti Das)
We all have our own battles; could be one that....

Pg 15 Midas Touch (Debabrati Chakraborty)
As a child, the tale of Midas......

Pg 16 বাঁক (দেবতনু ভট্টাচার্য)
পাঁঠাটাকে স্নান করিয়ে সিঁদুর আর মালা.........

Pg 19 তিলোত্তমা (শঙ্কর লাল সাহা)
কেন কান্নাকাটি কেন মিথ্যা.......

Pg 20 ইলিশ মাছ আর পহেলা বৈশাখ (অতনু দাশ গুপ্তা)
ধরুন, পহেলা বৈশাখের দিন আপনাকে যদি..........

Pg 23 মানুষ (মদন মোহন সামন্ত)
একটু কষ্ট করে খুঁড়লে পেতেও পার.....

Pg 24 কাঁঠাল গাছের গল্প (দিপিলা সামন্ত)
চৌধুরী দা'র এক চোখে তাকানোটা বড়.......

Pg 26 প্রকৃতি (ঈশিতা রায়)
প্রকৃতি আমায় বড্ড টানে......

Pg 27 অপ্রাপ্তির অসুখ (দীপাঞ্জনা ঘোষ)
বর্তমান আধুনিক জীবনে নানাবিধ শারীরিক.....

আলাপ (Alaap)

Pg 28 নতুন সকাল (অনিন্দ্য ব্যানার্জি)
শীতের সকাল ধূসর স্মৃতি.....

Pg 29 সাইকেল কাণ্ড (দেবব্রত মন্ডল)
মাঝে মাঝে আমি আমার কলেজ জীবনের.....

Pg 32 ১৪৩১ নিচ্ছে বিদায় (দীপক এবং জয়শ্রী)
শূন্য ঝোলা হাতে। বিষাদ বদন.......

Pg 33 Modern People (Dipanjana Ghosh)
Oh! what happened to these people?......

Pg 35-51 অঙ্কন এবং আলোকচিত্র (Drawings and photography)

Pg 53- 56 Some Glimpses of BAAC Events 2025

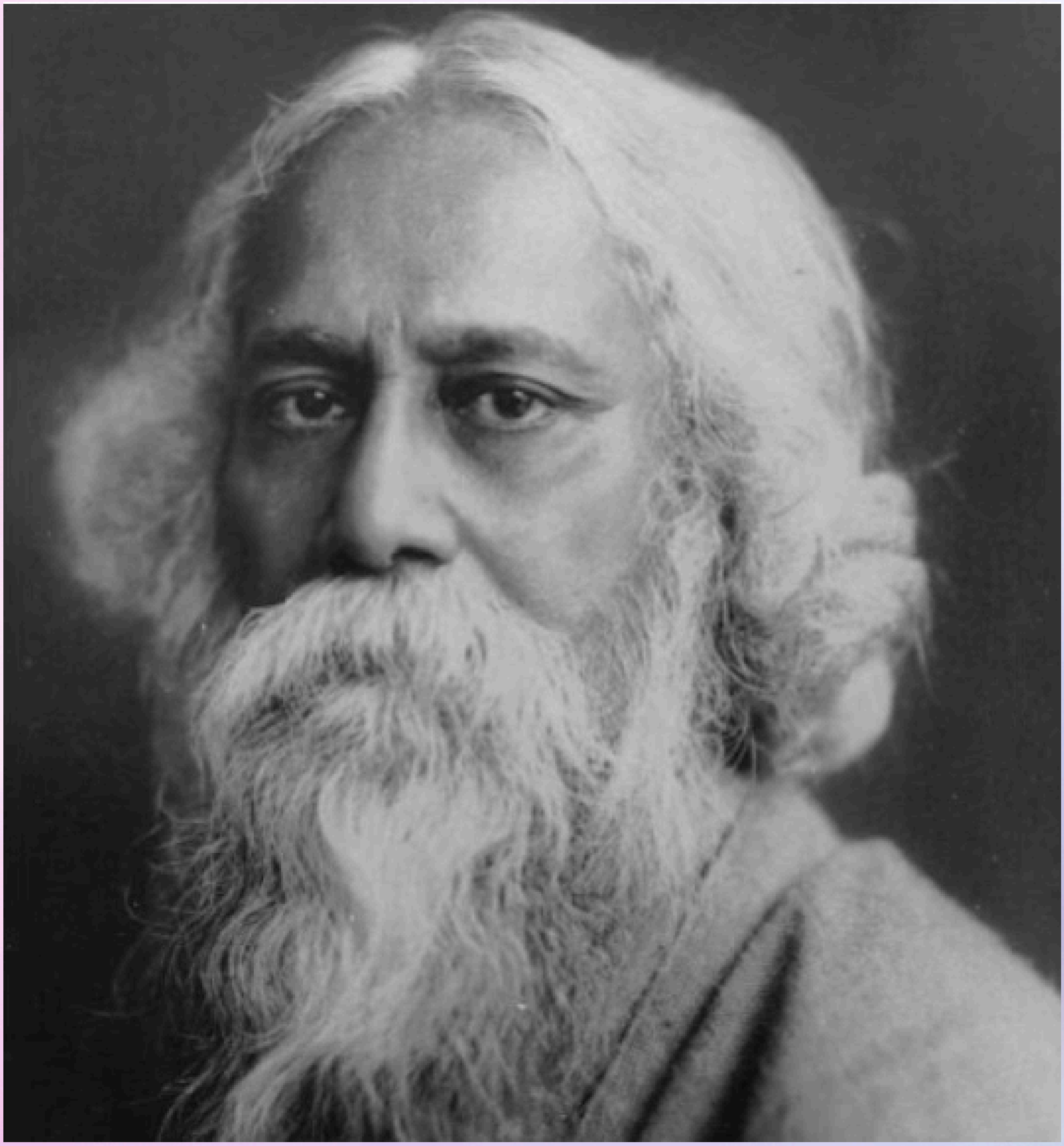

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাঁই -
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

ব্যাঙ ও বাঙালি

ব্যাঙ ও বাঙালি শব্দের ভিতর অনেক মিল আছে। তাই বাঙালি শব্দটির উৎপত্তি ব্যাঙ থেকে হলেও হতে পারে। এক সময় হয়তো পুরো বঙ্গীয় এলাকা নদী নালা, জলনিমর্জিত বিস্তর ভূমি ছিল, সেখানে ছিল লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ব্যাঙের বাস। ব্যাঙর আকৃতি অনেকটাই গোল সুতরাং ব্যাঙ থেকে ব্যাঙোল হওয়া খুব স্বাভাবিক! তাই হয়তো ব্যাঙোলে বসবাসকারী সবার মঙ্গলে আমরা স্বনামধন্য বাঙালি !

ব্যাঙ ও বাঙালির ভিতর অনেক আকৃতি, প্রাকৃতিক ও চারিত্রিক সাদৃশ্য আছে। আকৃতি? উভয়েই লেজহীন মেরুদন্ডী প্রাণী। উভয়ের গোলগাল চেহারা, চার হাতপা বিশিষ্ট। পিছনের পা' দুটো সামনের হাতদুটো থেকে লম্বা। দেহের নিচের ভাগটা অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু দেহের মধ্যভাগ যাহাকে উদর বা পেট বলে অভিহিত করে থাকি, তাহা মোটা। দেহের এইভাগটাকে অনেকে প্রহসন করে মধ্যপ্রদেশ বলে আখ্যা দেন । শরীর একটু বেশি নাদুসনুদুস হলে শরীর ও মাথার ভিতর প্রভেদ বোঝা মুশকিল।

ব্যাঙ ও বাঙালি উভয়েই খাদ্য রসিক, খাবারের বাদবিচার নেই। খাবার পরিমানে অনেক বেশি খায়। হাত, পাত, ভাত আর জাতপাত এই নিয়েই বাঙালির দৈনন্দিন জীবন যাপন । যে কোনো আলোচনার ভিতর খাবারের গল্প থাকবেনা সেটা হতেই পারে না। কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে কারও খাবারের সময় থালায় পর্বত সমান ভাতের পরিমান দেখলে মাথা ঘুরে মুখ থুবড়ে থালার উপর পড়তে হয়। ওই পর্বত চূড়া থেকে যখন গরম ধুয়া নিয়ে ডাল গড়ায়, মনে হয় আগ্নেয়গিরি লাভা গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের পাদদেশে। সব খাওয়া দাওয়ার শেষে সবার দৃষ্টি ওই মিষ্টির দিকে। চাই বড় বড় রসগোল্লা। পাতে একটা কম পড়লে শুরু হয়ে যায় হল্লাগোল্লা, খাওয়ার শেষে পেট পুরোই গোল্লা। আবার রাগ হলে ব্যাঙের মতই পেট ফুলে ঢাক। বাঁচার জন্য খাওয়া নয়, খাওয়ার জন্যই বাঁচা ! তারপর সমালোচনা, এটা ভালো হয়নি, সেটায় নুন হয়নি, লঙ্কা দেয়নি !

বাংলায় বৃষ্টি হয় একটু বেশি। উভয়েরই বৃষ্টির দিন পছন্দ। বৃষ্টি হলে আনন্দের আর সীমা নেই। বাইরে কাজ নেই, মাঠে যাওয়ার বালাই নেই, অফিস কাচারি নেই! ব্যস আর কি ! সন্ধ্যার সময় একটু অন্ধকার হতেই ব্যাঙের ডাকাডাকি শুরু হয় বিভিন্ন সুরে। রাগ রাগিণীর বাহার! যাদের লেজ পর্যন্ত ঝরে নি, গলা ফুলিয়ে তাদের মুখেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে শব্দ। ব্যাঙের মত সন্ধ্যাকালে বাঙালিরা -সে ছোট হোক আর বড়, হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধা শুরু, বড় বড় গায়ক। মান্না-মানবেন্দ্র'দের এক হাটে কিনে অন্য হাটে বিক্রি করে ! এদিকে গ্রামে গঞ্জে হারিকেনের আলোর সামনে বসে হেলে দুলে বাচ্চা কাচ্চা'দের বিভিন্ন্ সুরে বই পড়ার ধুম পড়ে যায়। ওই শব্দের অনুপ্রেণায় আরও সবার জোরে জোরে বই পড়ে। যে যত উচ্চস্বরে গলা ফাঁটিয়ে ঘ্যাঙর ঘ্যা করে পড়াশুনা করবে সে তত বড় পড়ুয়া, সেই বেশি মেধাবী।

বৃষ্টির সময় অন্ধকার নিঝুম রাতে ব্যাঙ ওদের দূরের কাছের প্রিয়জনদের আরও কাছে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সুরে উপসুরে ডাকাডাকি করে, উপযুক্ত প্রজননের সময় । বাঙালিরাও বৃষ্টিতে বেশি ভাবুক ও রসিক, কবিতা শুরু, গানে গানে আহ্বান, প্রাণে জাগে অনুকম্পন। মুখে ভুরিভুরি মিষ্টি মিষ্টি কথার ফুলঝুরি । ভাসুর শশুর সবাই তখন প্রেমিক, ডাকাডাকি তখন মুখে নয় চোখের ইশারায়। ফলে উভয়েরই ছানাপোনার আমদানি বেশি হয়। ব্যাঙের জন্ম নিয়ন্ত্রণের বালাই নেই, বাঙালিরা - "আমরা দুই আমাদের দুই" য়ে বিশ্বাসী নয়। কি আর বলি বৌঠান- সব উপরওয়ালার দান ! এই বৃষ্টি সব অনাসৃষ্টির কারণ ! বৃষ্টিতে ফসল ফলে বেশি ঠিকই কিন্তু ফসল খাওয়ার লোকও বেশি হয়ে যায় সে দিকে খেয়াল থাকে না!

ব্যাঙের পৃথিবী হল কুয়ো । ওরা শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির জন্য ইষ্ট দেবতার ভরসায় বসে থাকে, কবে ওই পুকুরে আরও জল হবে, আরও কচুরিপানা হবে, আরও বেশি করে ছানাপোনা হবে । কুয়োর বাইরেও যে জগৎ আছে সেটা তাদের ধারণার বাইরে। বাঙালির চিন্তাধারাও ওই কুয়োর ব্যাঙের মত। মান্ধাতার আমলের চিন্তাধারা, ধর্ম ভীরুতা ও গোড়ামিতে ভরা। একটু পড়াশুনা জানা বাঙালিরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী, পঞ্জিকার উপর নির্ভরশীল। দিনক্ষণ দেখে, নিঃস্বাস প্রস্বাস মেপে ঝুপে, শুভ যোগ দেখে তবে বাড়ি থেকে রওনা দেবে। পরনে নেংটি আর দশ আঙুলে দশ-দশখানা আংটি। হোক বয়সে আশি, ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ, কবিরাজে বিশ্বাসী।

ব্যাঙের মতোই অলস প্রকৃতির বাঙালি। কর্ম কম, খাবার দাবার দিবানিদ্রা বেশি, ঘর ছেড়ে বিদেশ বা অন্য রাজ্যে যেতে রাজি নয়। ব্যবসা বাণিজ্যে কোন মন নেই, অল্প উপার্জনেই খুশি। ওই ঝাল মুড়ির ব্যবসা করে, ঝাল মুড়ি চানাচুর খেয়ে সারা জীবন কাঁটিয়ে দিতে পারলেই যথেষ্ট। নুতন কিছু সহজে নিতে পারে না। শত বৎসর ধরে যা চলে আসছে তাই আঁকড়ে ধরে পরে থাকবে। ভালোর জন্য পরিবর্তন আনতে ভয় পায়, পাচ্ছে যদি কিছু হয় ! পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে রাজ্যে একই সরকারের স্বাশন শোষণ চললেও কারও কোনো মাথা ব্যথা নেই। কোনো শিল্প উন্নয়নের দরকার নেই। ঝালমুড়ি চপ শিল্প জিন্দাবাদ !

ব্যাঙের কিছু প্রজাতি আছে যেমন গেছো ব্যাঙ- ক্ষনে ক্ষনে শরীরের রঙ পাল্টায় তেমনি কিছু গেছো বাঙালিও আছে ক্ষনে ক্ষনে মনের রঙ, চরিত্র পাল্টায়, সব বহুরূপী। মনের মধ্যে জোয়ার ভাটা চলতে থাকে সর্বক্ষণ। আজ এই দলে, কাল অন্য দলে, সব সুবিধাবাদী। অনুকূল আবহাওযায় গা ভাসিয়ে অন্যের দুরাবস্থার মজা নেয়। বিদেশে এসে ভালো পরিবেশে থাকলেও এদের মন মানষিকতা একই। এদের কাছে কেউ মানুষনা , এরা মূল্যায়ন করে কে কোন জাতের, কে বাংলাদেশী, কে বিহারী !

হোক ব্যাঙের সাথে বাঙ্গালির মিল, থাক বুকের ভিতর ভীতি ভরা দিল, তবুও আমরা বাঙালি। দোষে গুনে, বৃষ্টি ফাল্গুনে, আমোদে প্রমোদে, আনন্দ ছন্দ গীতিতে ছায়ানটে, আমরা বাঙালি। অমানিশার আঁধারে আবার অরুনদীপ্ত প্রান্তরে, আমরা বাঙালি। সুদূর প্রবাসের ছায়ে, ধরণীর গায়ে চলি গুটিগুটি পায়ে তবুও আমরা গর্বিত বাঙালি। কাঙালি হয়ে গেলেও আমরা রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ, ঈশ্বরচন্দ, নজরুল, জসীমউদ্দীন, জীবনানন্দের রূপসী বাংলার বাঙালি !

-জীবন রায়

“The Leafy Color parade”
-By Poulomi

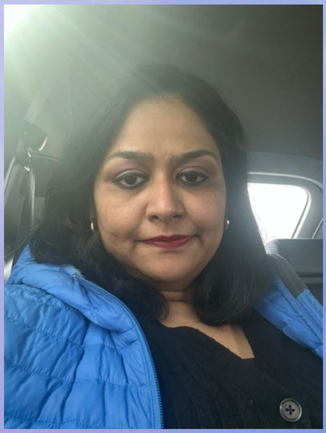

One fine day in breezy air,
A bunch of leaves danced everywhere.
Red ones twirled with cheerful flair,
While golden leaves flew here and there.
Orange leaves went spinning high,
Trying to tickle the blue sky.
Yellow giggled, light and bright,
Like sunshine giving hugs of light.
Green leaves joined with bouncy cheer,
Whispering, “Hello, spring is near!”
They fluttered fast, then swayed so slow,
Putting on a leafy show.
They didn’t need a marching band,
Just color, breeze, and nature’s hand.
Together they made a magic tune,
That danced beneath the sun and moon.
So if you see some leaves today,
Watch how they smile and gently play.
They may just whisper,
“Come along— We’re painting the world with a leafy song!”

Blue Lock: Rivals by Chitraksh Chowdhary

Blue Lock: Rivals is a popular game on the gaming platform Roblox. The game's inspired by the famous anime Blue Lock.

Basically, this game is a soccer game, except, you have special abilities called "styles". Here is the list of styles in the game.

1. Kunigami: Focuses on shooting and blocking, with powerful mid-range shots and defensive moves.
2. Nagi: Has 3 different moves called Trap, which allows you to control difficult passes with precision, Dash, a quick movement to evade opponents or reposition, and last but not the least, I Am Nagi, which does a powerful shot after a feint (a tactic used to mislead people.)
3. Shidou: Has 3 different moves named Dragon Drive, which is a strong drive shot after a jump, Dragon Header, a diving header after a rainbow flick, and Big Bang Drive, a high power bicycle kick.
4. Bachira: Has 2 different moves called Steal, where you dash forward to steal the ball, and Nutmeg, where you confuse your opponents by passing the ball through their legs.
5. Chigiri: A speedster style that has 3 different moves named Speedster, which increases your running speed for a short duration and puts in a stamina loss negation effect so you do not have to worry about your stamina running out anytime soon, Tireless, which gives you unlimited stamina for a limited time, and Acceleration, which teleports you forward for a short distance allowing you to close in on enemy defenders.

Now let's move onto Flow, which are passive abilities to improve your gameplay.

1. Soul Harvester: Offers increased defense and offense, making it a very versatile ability.
2. Snake: Improves agility
3. Prodigy: Adds a passive curve to normal shots, improving chances of scoring.
4. Awakened Genius: Grants additional dodgers, allowing you to evade opponents effectively.
5. Dribbler: Boosts dribbling skills for better control and cut-in's.
6. Demon Wings: Increases speed and mobility.
7. Crow: Improves aerial abilities for high passes and headers.
8. Gale Burst: Enhances sprint speed and stamina.
9. Kings Instinct: Improves decision-making skills and positioning.
10. Chameleon: Adapts to opponents' playstyle, providing situational advantages.
11. Lightning: Boosts reaction time for quick movements.
12. Ice: Slows down opponents movements slightly.
13. Puzzle: Improves overall teamwork and coordination.

And that is all for this article on Blue Lock: Rivals.

PS: I did not include everything in this, so make sure to check out the game to learn more or just watch videos on the game.

By Chitraksh Chowdhary

বারো মাসে তেরো পার্বণ

-জীবন রায়

বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বাংলা শুভনববর্ষ
বসন্ত গেলেও রেখে যায় তার কোমলতার স্পর্শ।
জৈষ্ঠ্য মাসে- জামাই ষষ্ঠী, জামাইদের বাহার,
বিনা কাজে শশুর বাড়িতে মস্ত মনে আহার।

আষাঢ় মাসের রথযাত্রায় শ্রীজগন্নাথের পূজা
শ্রাবণ ধারায় মনসা পূজায় ‘সয়লা’ গানের মজা।
ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীতে রাধাকৃষ্ণের জয়গান
আবার বিশ্বকর্মা পূজা উৎসবে ভরে সবার প্রাণ।

আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে ওঠে আগমনীর সুর,
দূর্গা মায়ের মুখখানি দেখে সবাই আনন্দে ভরপুর।
কার্তিক মাসের ভাই ফোঁটা, ভাইদের রক্ষা করে,
অগ্রহায়নের নবান্ন উৎসব চলে সবার ঘরে ঘরে।

পৌষ মাসে - পৌষ সংক্রান্তি পিঠে পুলির ধুম,
মাঘের সকাল সরস্বতী পূজায় সুসজ্জিত কুসুম।
ফাল্গুন মাসে দোল উৎসবে শুধুই রঙের খেলা
চৈত্র শেষে গ্রামে গ্রামে হয় চড়ক পূজার মেলা।

এমনিভাবে বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ চলে,
এ সব ছাড়াও অনেক অনুষ্ঠান হয় যে তলে তলে।
বাঙালির মন সারাক্ষন আনন্দ উৎসবে মেতে থাকে
ভ্রাতৃবন্ধন আর স্নেহভালোবাসায় সবারে বেঁধে রাখে।

We all have our own battles; could be one that we fought in the past or one on-going. Whether or not you have won or lost, does not matter. What's important is how we survived and the takeaways from it. So, to anyone and everyone who needs to hear "This too shall pass"

BATTLES WE FIGHT

Life is a battle, a constant fight,
Between dreams that soar and fears that bite.

Each step is a challenge, each breath, a test,
But we fight on, determined to do our best.
The scars we carry, the wounds we bear,
Are reminders of battles we've bravely dared.

Through the struggles, through the pain,
We learn to dance in the pouring rain.
For every step with faith you take,
A brighter world you'll surely make.

Remember, you're strong, and it's okay to bend,
The storm will pass, and peace will descend.
With each victory, each lesson learned,
In the fires of life, our strength is earned.

So, embrace the fight, don't shy away,
For life is a battle, but we'll find our way.

By Shrabanti Das

Midas Touch

As a child, the tale of Midas' Touch always enchanted me — the magical power to turn everything into gold with a single touch. Back then, it felt like the peak of fantasy, a sparkling dream spun from folklore. But as I grew older, I realised that stories like these were nothing more than myths, tucked away in the corners of childhood imagination.
And yet, life has a strange way of bringing stories to life. I've come to realise that Midas does exist — not in shimmering robes or ancient palaces, but in quiet corners of our everyday lives.
Today, as I stepped inside in my otherwise clumsy flat, something felt different. Not loud or obvious — just a quiet kind of order, a silence that hummed with care.
The latch on my door, which had refused to bolt for nearly six weeks, now clicked shut with a satisfying ease. The shower, which had been stubbornly dripping for days, no longer whispered its midnight lullaby. In the kitchen, the slab gleamed — free of crumbs, free of clutter, almost like it had taken a deep breath and exhaled peace.
Out in the balcony, even the clothesline — the one that snapped just last night — now hung taut, ready to hold the weight of a dozen sun-drenched clothes.
For a moment, it felt unreal. As if some quiet miracle had unfolded in my absence. Like a fairy godmother had tiptoed through my home, waving a wand, leaving behind trails of gold dust and silent magic.
And then it struck me. No wand. No fairy. Just Baba.
The man who, without a word, fixes broken things — not just bolts and taps, but days and hearts. He's been doing this all my life. Turning everyday mess into moments of quiet magic. His touch doesn't turn things to gold. It turns them whole.
I live alone in Kolkata, in my cozy flat that's often a little cluttered and a little whimsical, much like me. It's not the perfectly kept home that Baba would run or that Ma would sweep into shape. But whenever they visit, even for a short while, something shifts.
My world — usually quiet and scattered — fills with life. My house transforms, quite literally, into a paradise. Their presence doesn't just clean the corners or fix the taps. It heals. It lifts. It wraps everything in warmth.
And Baba — with his quiet strength and tireless hands — brings with him the true golden touch of Midas. Not the one that turns objects into gold but the one that turns an ordinary day into something precious. Something unforgettable.

By Debarati Chakraborty
(Kolkata)

বাঁক

(১)

পাঁঠাটাকে স্নান করিয়ে সিঁদুর আর মালা পরিয়ে যখন লোকটা পরম যত্নে যূপকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, সমীরণ তখন কামাক্ষ্যা মন্দিরের দর্শনার্থীর লাইনে। এক অদ্ভুত শিরশিরানির কাঁপন লক্ষ্য করছিল সমীরণ পাঁঠাটার সারা শরীর জুড়ে। নভেম্বরের সকালে স্নান করে উঠে খুব সম্ভব ঠাণ্ডা লাগছিল তার। তার চেয়েও আশ্চর্য ছিল ওর বাধ্য পায়ে মালিকের সাথে এগিয়ে যাওয়ায়। কোন ঝটপট লক্ষ্য করে নি সমীরণ ওর চলনে। করলে, ওই আলগা দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারত সে। সকাল থেকে না খেয়ে থাকা পাঁঠাটি হয়ত সঙ্কল্প করা মানুষটির যত্নকে মমতা বলে ভুল করছিল। শুধু বলির কাঠে বেঁধে দেওয়ার পর সে কচি গলায় চিৎকার করে তার প্রতিবাদ জানিয়ে গিয়েছিল শেষবারের মতো। মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে। মানুষের ক্রূঢ় বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে। মর্মান্তিক সেই চিৎকার সমীরণকে বেশ কিছুক্ষণ মূহ্যমান করে রেখেছিল।

'অমানবিকতার শিকার কি শুধু পশুরাই হয় নীল? মানুষ কি শুধু পাশবিকতার শিকার হয়?'
পেছন থেকে মায়ার ছুঁড়ে দেওয়া কথাগুলোয় সম্বিত ফিরল সমীরণের। মায়ার এই অসম্ভব সেন্সিটিভিটির জন্যই প্রেমে পড়েছিল সমীরণ। মায়ার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল শুধু। মাথা পিছু পাঁচশ এক টাকার ভি আই পি টিকিট কেটেও কামাক্ষ্যায় লাইনে দাঁড়াতে হয়। বিনা টিকিটের লাইন হলে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লাগে, কখনো কখনো আরো বেশি। ভি আই পিরা সেটাই মোটামুটি এক থেকে দেড় ঘন্টায় দর্শন সেরে বেরিয়ে আসতে পারে। এক হাজার দু' টাকা দিয়ে সমীরণরা এই সময়টুকুই কিনেছিল। সকালেই ওরা দুজনে পৌঁছেছে কামাক্ষ্যায়। গাড়ি নিয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে। সমীরণের হাত যশে প্রায় তিনশ কিলোমিটার চার লেনের এই রাস্তা সাত ঘন্টাতেই পেরিয়ে আসা গেছে। কামাক্ষ্যা পাহাড়ে মন্দিরের কাছাকাছি একটা হোটেল নিয়ে স্নান সেরে পাণ্ডা যোগাড় করে দুজনে এই মুহূর্তে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে, কিউয়ের রেলিং সেখানে বলি কাঠের পেছন দিয়ে ঘুরে গেছে। সরাসরি বলি দেখা না গেলেও, নিরীহ পশুদের আর্ত চিৎকার চাপা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষ তো আসলে পশুরই নামান্তর। তাই শব্দরোধের মতো এমন সংবেদনশীল বিষয়টির দিকে নজর মন্দির কমিটির কারুরই পড়ে নি। সমীরণ ভাবছিল। মানুষের আরাধ্য দেব-দেবীরাও বোধহয় সংবেদনশীলতা হারিয়েছেন বহুদিন। তাই সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার বছরের বলি প্রথা বন্ধ হয় নি আজও। ফ্যালাসি এটাই যে এসবের পরেও, আরাধ্য সর্বশক্তিমানদের ভক্তজন নিজেদের সভ্য হবার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গর্ববোধ করে। এত কিছুর মধ্যেও তবু কেউ কেউ মানুষ হয়। কিংবা হবার প্রতিনিয়ত একটা চেষ্টা করে যায় অন্তত। যেমন মায়া। তাই অনায়াসে মায়া বলতে পারে - 'অমানবিকতার শিকার কি শুধু পশুরাই হয় নীল?'

(২)

'গেট আপ মাই বয় - ডোন্ট লেট মি ডাউন কিডো!' সি আই ডির দুঁদে অফিসার মিস্টার সরকার যখন তার আট বছরের ছেলে নীলের দিকে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলছিলেন, সে তখন মাঠের মাঝখানে ধুলো মেখে পড়ে আছে। ঝর ঝর করে তার নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বয়সে বড় কিছু ছেলে তার পেছনে লেগেছে। নীলের অপরাধ ছিল, সে প্রতিবাদ করেছিল। একটা নেড়ি কুত্তার বাচ্চাকে নিয়ে ছেলেগুলো বলের মতো লাথি মেরে খেলা করছিল। নীল সহ্য করতে পারে নি অমন নৃশংস দৃশ্য। অসহায় সারমেয় শাবকটির মর্মভেদী হাহাকার। আর ফল স্বরূপ দলের একজন ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিল তার। মিস্টার সরকার একটু দূরে ছিলেন। এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারীতায় মগ্ন ছিলেন। রক্ত আর ধুলো মাখা নীলের কাছে এগিয়ে আসতে তাঁর একটু সময় লেগে গিয়েছিল। 'গেট আপ সান!' দূর থেকেই ছুটে আসতে আসতে গর্জন করে উঠেছিলেন মিস্টার সরকার। নীল উঠে দাঁড়িয়েছিল কোনমতে। কিন্তু বয়সে বড় চারটে দামড়া ছেলের সাথে যুঝে ওঠার মতো ক্ষমতা তখনো তার ছিল না। ওরা মিস্টার সরকারকে দেখে নীলকে আর কিছু করল না ঠিকই, কিন্তু কুকুরের ছানাটাকে কোলে নিয়েই এক ছুটে কিছুটা দৌড়ে গিয়েই খুব জোরে বল ছোঁড়ার মতো ছুঁড়ে দিয়েছিল নীলের দিকে। দিয়েই জোরে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। যেদিক দিয়ে মিস্টার সরকার ছুটে আসছিলেন, তার ঠিক বিপরীত দিক দিয়ে। নীল টলতে টলতে কোনমতে দৌড়ে গিয়েও ধরতে পারে নি বাচ্চাটাকে। মারা গিয়েছিল বাচ্চাটা ঘাড় ভেঙে। মুখে রক্ত উঠে। নীলের সামনেই।

এত বছর পরেও সমীরণের মন যখন এই পুরো ব্যাপারটার অ্যানালিসিস করে, নিজের বাবা মিস্টার শুভাশিস সরকারকে প্রতিবার দোষী সাব্যস্ত করে তার মন। সেই সময় বাবা এগিয়ে গেলে, নিশ্চিত এমনটি ঘটত না। কেন কে জানে, সমীরণের আজও মনে হয়, ঠিক যতটা জোরে দৌড়ে এলে ছেলেগুলোর হাত থেকে শাবকটিকে বাঁচানো যেত, ততটা জোরে মিস্টার সরকার দৌড়ে আসেন নি। কোথাও যেন একটা ইনারশিয়া ল্যাগ ছিল। অথচ বাবা সক্ষম ছিলেন না এমন নয়। 'নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয় নীল - অন্য কেউ তোমার হয়ে লড়াইটা লড়ে দেবে না।' মিস্টার সরকারের বলা কথাগুলো, শিক্ষাগুলো বয়স বাড়ার সাথে সাথে ইদানীং প্রহসন লাগতে থাকে সমীরণের। মানুষের জন্মলগ্ন থেকে কি কোন এমন একটা দিনও ছিল, যে দিনটায় গোটা পৃথিবীর কোথাও কোন লড়াই হয় নি? এই যে প্রতিদিন অগুন্তি লড়াই লড়ে মানুষ, খুনো খুনি হয়- তার সব কটাই কি শুধু নিজের জন্য লড়াই? বেঁচে থাকার জন্য লড়াই? কোন অন্যায্য, অযৌক্তিক, অন্যায় লড়াই কি মানুষ লড়ে না? হয় না? কোথাও? শুধুমাত্র লড়াইয়ের তাগিদেও তো কত লড়াই হয়, হতো, হবে। তাই না মিস্টার সরকার? সেদিন সেই লড়াইটাও এমনই এক লড়াই ছিল। সেটা নীলের নিজের ছিল না। কোনমতেই না!

(৩)

লাইন ক্রমশ এগোতে থাকে। এই নিয়ে চতুর্থবার সমীরণ এল কামাক্ষ্যা মন্দিরে। মায়ার এই প্রথম। ধর্ম এমনই এক নেশা, যা মানুষকে ক্রমশ বিহ্বল করে দেয়। করে দেয় বিবশ। মানুষ তখন নির্দ্বিধায় সব কিছু মেনে নেয়, প্রশ্ন করে না। সমীরণ লক্ষ্য করল, মন্দিরের গায়ে খোদাই করা বিভিন্ন শৈল্পিক স্থাপত্য মূর্তির পাদদেশেও ইদানীং মানুষ ফুল পয়সা দিয়ে যাচ্ছে। পাণ্ডাদের রমরমা বেড়েছে। যেখানে সেখানে সিঁদূর পরিয়ে পয়সা চাইছে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। অথচ ধর্মের অন্ধবিশ্বাস দেখে মনে কৌতুক অনুভব করা এই সমীরণই কোথাও অবচেতনে মায়াকে এখানে নিয়ে আসার জন্য ব্যাকুল ছিল। দীর্ঘ আট বছর সন্তান নেই তাদের। একান্ন পীঠের শ্রেষ্ঠ পীঠ কামাক্ষ্যা মাকে মনের আকূতি জানানোর প্রবল ইচ্ছেই সমীরণকে টেনে আনল আবার। প্রথমবার যখন সমীরণ এসেছিল, পুজো শেষে জনৈক পাণ্ডা এক ফালি লাল কাপড় সমীরণের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ' এ বড়ো পবিত্র কাপড়। অম্বুবচীর সময় যে লাল জল বেরোয়, তাতে চুবানো কাপড়। এই মন্দিরে মায়ের গর্ভে যে কোথা থেকে জল আসে, আজও তা রহস্য। নীচ দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে যাচ্ছে। তবু এত উঁচুতে পাহাড়ে মায়ের গর্ভ গৃহে সারা বছর জল ওঠে। এই জল কিভাবে, কোথা থেকে আসে কেউ জানে না। অম্বুবচীর সময় এই জল লাল হয়ে যায়। মা ঋতুমতী হন সেই সময়। নে বেটা, এটা রাখ'। সমীরণ সরল মনে প্রশ্ন করেছিল,' কিন্তু ঠাকুর, লাল কাপড় দেখে বুঝব কি করে যে জল সত্যিই লাল হয় কি না?' পাণ্ডা হায় হায় করে উঠেছিলেন,' মা'র প্রতি কোন সন্দেহ রাখিস না রে বেটা! মহাপাপ হয়! কুচবিহারের রাজবংশ নির্ব্বংশ হয়ে গেছে এই অবিশ্বাস থেকেই'। সমীরণের অবচেতনে কথাগুলো গেঁথে গিয়েছিল। বায়োলজিক্যাল যত কারণই থাক, সমীরণ আজও মনে করে হয়ত এই কারণেই মায়া আজও গর্ভবতী হতে পারে নি। হয়ত। ওভারি ভাল থাকা সত্ত্বেও। হয়ত।

অথচ সে এসেছিল। কেউ একজন। বছর দুই আগে। দীর্ঘ ছ'বছর পরে যখন মায়া টের পেল প্রথমবার, সমীরণ তখন সকালের শেষ ঘুমের ওম পুষিয়ে নিচ্ছিল। মায়া বাথরুম থেকে বেরিয়েই চেঁচিয়ে উঠেছিল,'নীল! আমি প্রেগন্যান্ট!'

তারপর দু'হপ্তা যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল ওদের জীবনে। ফেটাসের হার্ট বিট কম থাকায় দেড় হপ্তার বেশি বাঁচে নি। তিন নম্বর গাইনি দেখিয়ে যখন সমীরণ আর মায়া নিশ্চিত হল যে ওয়াশ করা ছাড়া কোন উপায় নেই, মায়ার মুখে তখন ক্লান্ত হাসি। 'আমায় একটা পেস্ট্রি খাওয়াবে নীল?' নিজেদের পেস্ট্রি আর বার্গার উপহার দিয়ে ওরা পরদিনের ধকলের শক্তি সঞ্চয় করেছিল। সব খাওয়াই তৃপ্ত ভোজন হয় না। নিজের ওই সময়ের দিনগুলোতে সমীরণ বুঝেছিল, আর কেউ না হোক, অন্তত মায়া তাকে কোনদিনই বলবে না কথাগুলো -'নিজের লড়াই নিজেকেই লড়ে নিতে হয় নীল...'। তবু সত্যি কথা বলতে কি, কষ্টটা মায়ারই ছিল বেশি। অন্তত ফিজিওলজিক্যাল। সমীরণের মতো না হওয়া বাবারা ব্রাত্যই থেকে যায়। মিস্টার শুভাশিস সরকার আর যাই হোক, সমীরণের মতো না-হওয়া বাবা ন'ন। হি হ্যাড আ চয়েস।

(৪)

পরদিন সকাল সকাল স্টার্ট করেছিল সমীরণরা। কামাক্ষ্যা থেকে বঙ্গাইগাঁও, বারপেট্টা, ধুবড়ি হয়ে আলিপুরদুয়ার পৌঁছতে প্রায় এগারোটা বাজবে। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ যখন ওরা বঙ্গাইগাঁও পার হচ্ছে, ঠিক তখনই সমীরণের মোবাইলে কলকাতা থেকে ফোনটা এল। পাড়ার ট্যারা দা -' নীল, কাকুকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তুই কতক্ষণে পৌঁছতে পারবি?'

চমকে উঠল সমীরণ। কিছু বলে ওঠার আগেই হাজার প্রশ্ন করে বসল মায়া, 'কখন হয়েছে? বাবার কি জ্ঞান আছে? কোন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছো?' মায়া এইরকমই। মমতাময়ী। সদা হাসিমুখ। ক্ষমাশীলা। সমীরণ নিজেদের কঠিন ওই সময়টায় যখন নিজের বাবাকে দ্বিতীয়বার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল, মায়া প্রতিবাদ করে উঠেছিল,'থিংক হিউম্যানলি নীল। উনি নিজে দাদু হওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন। এটা এই বয়সে একটা দারুণ শক! আর তাছাড়াও, ওই সময় উনি এসে করতেনই বা কি? একজন মহিলা হলে হয়ত উনি অবশ্যই আসতেন, তাই না?'

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সমীরণ। ঠিক এই সময় ঘটনাটি ঘটল৷ দুম করে একটা কুকুর হাইওয়ে পেরোতে গিয়ে সমীরণের চাকার তলায়। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সমীরণ। নেমে দেখল, কুকুরটার প্রায় শেষ অবস্থা। রক্তে রাস্তা ধুয়ে যাচ্ছে। তবে তখনো প্রাণ আছে প্রাণিটির শরীরে। ধুক পুক করছে দ্রুত। মায়া নামে নি গাড়ি থেকে। ও এইসব দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। ভালই করেছে। এক অদ্ভুত দ্বিধায় পড়ল সমীরণ। বাবার প্রতি সেই ছোটবেলার প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছেটা যেন ক্রমশ প্রবল হচ্ছে মনের মধ্যে। ফাইট মিস্টার সরকার, ফাইট। নিজের লড়াইটা নিজেই লড়ো। তুমি তো মানুষ! আর গাড়ির তলায় পড়া জীবটা এক অবোলা জীব। নিরীহ। নিজের খাবার আর সিকিওরিটি ছাড়া যে কোনদিন শুধু প্লেজারের জন্য যুদ্ধ করে নি। যেমন নিরীহ ছিল সেই বাচ্চাটা। একে বরং কাছাকাছি কোন পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাক। ফাইট মিস্টার সরকার ফাইট! দেখো হৃদয়ের যন্ত্রণা কেমন লাগে এখন! হার্ট অ্যাটাকের যন্ত্রণা কি বুক ভাঙা কান্নার চেয়েও বেশি?

বনেট ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল সমীরণ। চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো। ওর অভিজ্ঞ চোখ জানে কুকুরটি আর বাঁচবে না। যে পরিমাণ রক্ত ক্ষরণ হয়েছে, তাতে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে। হৃৎপিণ্ড ক্রমশ দ্রুততর হচ্ছে সারমেয়টির। পরম মমতায় ওকে দু'হাতে তুলে সন্তর্পণে রাস্তার ধারে মাঠের পাশে শুইয়ে দিল সমীরণ। মনে পড়ে গেল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের কথাগুলো-'মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম সমীরণ। অনন্ত সম্ভাবনার ভাণ্ডার। কোন কিছুর জন্যই মানুষকে অবহেলা করা যায় না'। 'আর অবোলা জীবগুলো?' ছোট্ট সমীরণ প্রশ্ন করেছিল মহারাজকে। 'ওদের মানব জন্মে উত্তরণ ঘটে। তাই ওদের মৃত্যুতে কাঁদতে নেই রে।' মহারাজ স্মিত হেসেছিলেন। হৃদয়ে বড় প্রশান্তি পেয়েছিল সমীরণ সেইদিন।

গাড়ির জলের বোতল থেকে একটু জল ছোঁয়ালো সমীরণ কুকুরটার মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালো। যতক্ষণ আহত সারমেয়টির বুক ধুক পুক করছিল- ততক্ষণ। কিংবা আরও একটু বেশি সময়। এই ফাঁকা হাইওয়েতে দেখার তো কেউ নেই। কেউ নেই কারুর জন্য দু'দণ্ড দাঁড়াবার। সব শান্ত হয়ে গেলে, হাত জোড় করে প্রণাম করল সমীরণ সারমেয়টিকে।

'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ , ওঁ শান্তিঃ।।'

ফিরে এসে গাড়ি স্টার্ট করে ইউ টার্ন নিল আলিপুরদুয়ারের সরকারী ভেটেরিনারি চিকিৎসক ডঃ সমীরণ সরকার। বাগডোগরার চেয়ে গৌহাটি কাছে পড়বে। মায়া ততক্ষণে মোবাইলে গৌহাটি থেকে কলকাতা ফ্লাইটের টিকিট খুঁজতে ব্যস্ত।

(শেষ)

-দেবতনু ভট্টাচার্য

তিলোত্তমা

-শঙ্কর লাল সাহা
(কলকাতা)

কেন কান্নাকাটি কেন মিথ্যা কলরব ?
কেন মনঃকষ্ট কেন হাহাকার রব ?
তুমি যেমনটা আছো তেমনটাই থাকো ,
লক্ষ্য নিজেকে শুধু কলঙ্কমুক্ত রাখো ।

সমাজের কালো হাত দুর্বৃত্ত দিচ্ছে সাথ ,
ওই সমাজে আছে শুধুই অন্ধকার কালোরাত ,
নেই খোলা মুক্ত বাতাস নেই বিন্দু শুদ্ধ শ্বাস ,
নেই কোন সুস্থ আশ নেই কোন বিশ্বাস ।

নিজেকে শান্ত রাখো চিন্তা মুক্ত থাকো ,
যেমন মাথা ঠাণ্ডা রাখার ঠাণ্ডা তেল মাখো ,
বাজে চিন্তা বিদায় করো থাকো অকুতোভয়ে ,
ওযে বড্ড যন্ত্রণা দেয়, মুক্ত করো জয়ে ।

আচ্ছা ভেবে দেখোতো তোমার কিসের সমস্যা ,
ওটাতো সবারই আছে সবারই বারোমাস্যা ,
তুমিতো নওগো একা এই বৃহৎ ত্রিভুবনে ,
সবাইতো বসবে না আর যোগ্যতার একাসনে ।

যদি হও কালো জেনো তবু তাও ভালো ,
কথাতেই আছে কালো জগতের আলো ,
নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা সঠিক দীক্ষা মন করো উন্মুক্ত ,
নম্র ব্যবহারই তোমার আসল সোনা বহুদামী রক্ত ।

যদি তুমি হও ফর্সা তাতে কি আছে ভরসা ?
যদি না থাকে সামাজিক বোধ, আলটপকা সহসা ?
না করে গর্ব না রেখে মিথ্যা উগ্র অহঙ্কার ,
ব্যাবহারেই দাও পরিচয় না করে উচ্চ ঝঙ্কার ।

বোবার শত্রু নেই অন্ধের যষ্ঠিই মিত্র ,
ওদের বোধশক্তি প্রখর আছে অতিরিক্ত ,
কিন্তু অকারণে করেনা লড়াই করেনা মিথ্যা বড়াই ,
অসহায় জীবন চলে বেয়ে বেয়ে চড়াই উৎরাই ।

তাই যখন আসবে চাপ নির্বিদ্বিধায় করো সাফ ,
না রেখে দ্বন্দ্ব না ভেবে মন্দ এগিয়ে চলো ধাপ ,
ধৈর্য্য রেখে এগিয়ে চলো মিতভাষী হয়ে ,
তির্যক কটূ কথা শুনেও থেকো শান্ত নীরবে সয়ে ।

ইলিশ মাছ আর পহেলা বৈশাখ

ধরুন, পহেলা বৈশাখের দিন আপনাকে যদি বলা হয় আজ থেকে পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ খাওয়া বন্ধ, তখন কি করবেন?
বাজারে গেছেন। দেখলেন সব মাছ রয়েছে, ইলিশ বাদে!
কেমন হবে মনের অবস্থা?
বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ।

বৈশাখের প্রথম দিন নানান মুখরোচক খাবারের আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম মাটির সানকিতে ভরা পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ। হরেক রকমের খাবারের পদের মধ্যে এর উপস্থিতিকে অনেকেই বাঙালীয়ানার ছাপ বলে অভিহিত করেন।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইলিশ মাছ আর পহেলা বৈশাখের যোগাযোগ বেশি দিনের পুরোনো নয় বরং সাম্প্রতিক সময়ের।
আশিক দশকের।

বৈশাখ মাস - চারিদিকে খাঁ খাঁ করা রৌদ্রের উত্তাপ, কাঠফাটা গরমে সকলের নাভিশ্বাস হয়ে যায়। ওই সময়ে গ্রামের কৃষকেরা ইলিশ মাছ আর পান্তা ভাত খেয়ে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের বিষয়টা কাল্পনিক। এমন সময়ে কৃষকের আর্থিক অবস্থার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।
তাহলে কি করে পান্তা ভাত আর ইলিশ মাছ খাওয়ার চল শুরু হল?

বাঙালি ঠিক কত বছর আগে থেকে পান্তাভাত খায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায় পান্তার বর্ণনা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'কালকেতুর ভোজন' এ লিখেছেন, 'মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে/এক শ্বাসে সাত হাড়ি আমানি উজাড়ে/চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ/ছয় হান্ডি মুসুরি সুপ মিশ্যা তথি লাউ।'
এখানে 'আমানি' হলো পান্তার জলীয় অংশ। বাংলা নববর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন আঞ্চলিক অনুষ্ঠান ছিল আমানি। এটি ছিল মূলত নতুন বর্ষে কৃষকের নিজস্ব আয়োজন। চৈত্র সংক্রান্তির শেষ বেলায় কৃষাণী হাঁড়িতে অপরিপক্ক চাল ছড়িয়ে কচি আমপাতার ডাল বসিয়ে দিতেন। নববর্ষের দিনে সূর্যোদয়ের আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে আমপাতা সহযোগে সেই পানি উঠোন ও ঘরে ছড়িয়ে দেন কৃষাণী। এরপর সেই ভেজানো ভাত পরিবারের সবাইকে খেতে দেওয়া হয়।

আমানি মূলত নববর্ষের আদি উপাদান। গত কয়েক শতবর্ষ ধরে পান্তা খেয়ে থাকে বাঙালি। বাঙালির সংস্কৃতির পুরোভাগই যেহেতু কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই পান্তাই ছিল সবচেয়ে সহজলভ্য। অন্যদিকে পান্তাভাত ছিল কৃষকের শারীরিক শক্তির উৎস। একসময় সূর্যোদয়ের পর পান্তা খেয়েই কৃষক মাঠে যেতেন। বাঙালি শরীরচর্চাবিদ মনোহর আইচ এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "পান্তা ভাতের জল, তিন জোয়ানের বল।" একইসঙ্গে নিজের শক্তির উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, আমি দিনে চারবেলা পান্তাভাত খেতাম।

বাংলার আবহমান গ্রাম বাংলায় পান্তা ভাত খাওয়া হতো নুন, কাঁচা লঙ্কা কিংবা বড়জোর পেঁয়াজ সহযোগে। পান্তা খাওয়ার বাসন হিসেবে দরিদ্র কৃষকের কাছে মাটির বাসন ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না। কৃষক পান্তা খেত কচু পাতায় কিংবা কলা পাতায়।

আর তাই তো ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন 'আনিয়া মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত'। 'মান' বলতে এখানে মানকচুর কথা বোঝানো হয়েছে। তথা মানকচুর পাতায় করে পান্তা ভাত বেড়ে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কালের পরিবর্তনে পান্তার সঙ্গে একসময় যুক্ত হয় আলু ভর্তা কিংবা পোড়া বেগুন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের সহজলভ্য মাছ। এসব মাছের মধ্যে ছিল পুঁটি, কৈ, টাকি কিংবা ট্যাংরা, যা বিলে কিংবা পুকুরে সহজেই পাওয়া যায়।মাছে ভাতে বাঙালি হলেও ইলিশের সংযোগ তারও ঢের বাকি। কারণ ইলিশের দাম সবসময়ই ছিল খানিকটা চড়া। অন্যদিকে, ইলিশের দাম চড়া হওয়ায় তা গরম ভাতের সঙ্গে খেতেন গ্রামের মানুষ। পান্তার ভাগ্যে তা আর জুটতো না। অন্যদিকে, শহরের বিত্তবানদের কাছে পান্তাই ছিল আদতে গরীবের খাবার। ফলে ইলিশ তাদের কাছে সহজলভ্য হলেও পান্তা হেঁশেল ঘরের গণ্ডি পেরোতে পারতো না।

ইলিশের সুখ্যাতি বরাবরই লিখিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে থেকে রাজনীতিতে বা আড্ডা মহলেও সেখানে পান্তার সুখ্যাতি ছিল না। ইলিশ যতখানি না সগৌরবে আলোচিত হত, সে তুলনায় পান্তা ছিল অনেকখানি অপাংক্তেয়। ফলে পান্তার সঙ্গে ইলিশের সংযোগ বাংলার ঘরে দেখা মিলেনি। তবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গত শতকের আশির দশকে ঢাকায়। ষাটের দশক থেকেই রমনার বটমূলে নববর্ষের প্রথম দিনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে থাকে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। ১৯৬৭ সালে শুরু হয়েছিলো ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। দেশ স্বাধীনের পরও তা অবিচল থাকে।

তবে ছায়ানটের মাধ্যমে কিন্তু পান্তা ইলিশ উঠে আসেনি। পান্তা ইলিশের প্রচলন শুরু হয়েছিলো ১৯৮০/৮১ সালের বর্ষবরণে। সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সেবারের বর্ষবরণের কিছুদিন আগে সাংবাদিক বোরহানউদ্দিন আহমেদ প্রথম নববর্ষ উদযাপনের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে পান্তা ইলিশ আয়োজনের প্রস্তাব দেন। অতঃপর তার বন্ধু, সহকর্মীরা জনপ্রতি চাঁদা তুলে পান্তা ইলিশের আয়োজন করেন। সে আয়োজন নিছক আড্ডাসুলভ হলেও পান্তা ইলিশ আয়োজনের কথা ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর 'ছুটির ফান্দে' খ্যাত গীতিকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক শহিদুল হক খান রমনায় পান্তা ইলিশের আয়োজন করেন। একইসঙ্গে তিনি পান্তা ইলিশের পোস্টার এঁকেও পান্তা ইলিশকে জনপ্রিয় করে তুলেন।

আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় রমনার বর্ষবরণের অনুষ্ঠান সবার কাছেই আরাধ্য হয়ে উঠে। ফলে ছায়ানটের বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের পাশেই জমে উঠে পান্তা ইলিশ ছন্দ। সাংস্কৃতির কাছেই ব্যবসায়িক বুদ্ধি, দুয়ে মিলে পান্তা ইলিশের বিক্রি বাট্টা দেদারসে বাড়তে থাকে। সে বছরগুলোতে মাটির সানকিতে করে পান্তা ইলিশের সঙ্গে যোগ হয় নানা পদের ভর্তাও। এমন সময়ে কিছু বাড়তি উপার্জনের আশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী রমনা বটমূলে পান্তা ইলিশ বিক্রি শুরু করলে তা রীতিমতো তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পান্তা ইলিশ তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কয়েক বছরের মধ্যে পান্তা ইলিশ দেশব্যাপী রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেয়। অনেকের দৃষ্টিতে তখন পান্তা ইলিশ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালিয়ানার অন্যতম অনুষঙ্গ। প্রথম পর্যায়ে ইলিশ মাছ দুর্লভ না হওয়ায় পান্তা ইলিশ অনেকেরই সাধ্যের মধ্যেই ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ইলিশ হয়ে উঠে বহু আরাধ্যের বস্তু।

জনপ্রিয়তার পালাবদলে নব্বইয়ের দশকে পান্তা ইলিশ হয়ে উঠে নববর্ষে বাংলাদেশিদের কাছে পরম আরাধ্য। কেবল ঢাকা কিংবা বিভাগীয় শহরগুলোই নয়, জেলা শহরের অলিগলিতেও নববর্ষের দিনে পান্তা ইলিশের বিক্রি দেখা যেত। পান্তার জোগান না হয় হলো, কিন্তু ইলিশের জোগান তো সীমিত। প্রথম দিকে ইলিশের দাম বাড়লেও একপর্যায়ে ইলিশের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলিশের জোগান দিতে রীতিমতো শুরু হয়ে জাটকা নিধন কর্মসূচী। ফলে সরকারকেও বাধ্য হয়ে দুই মাস নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে জাটকা রক্ষা কর্মসূচি নিতে হয়। বর্তমানে ছোট ইলিশ মাছকে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে পদ্মা ও মেঘনা, কালাবদর, তেঁতুলিয়া নদীসহ দক্ষিণাঞ্চলে মাছের পাঁচ অভয়াশ্রমে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস সব ধরনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সরবরাহ তো আর পুরোপুরি বন্ধ থাকে না। তাই শহুরে পান্তা ইলিশ পরিবেশনে ইলিশের জোগান দিতে মাঘ মাস থেকেই ব্যবসায়ী ও মজুতদারেরা হিমাগারের বরফে ইলিশ সংরক্ষণ শুরু হয়।এ প্রেক্ষিতে বলা যায় পান্তা ইলিশ যতখানি না বাঙালি সংস্কৃতির দাবীদার তারচেয়েও ব্যবসায়িক বুদ্ধির চমৎকৃত ফসল। তবে ব্যতিক্রম পান্তা।

আবহমানকাল ধরে পান্তা বরাবরই ছিল বাঙালির দৈনন্দিন খাবার। এটি কখনোই নববর্ষের প্রথম দিনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে পান্তা ইলিশের প্রবর্তন হলেও নববর্ষের প্রথম দিনে আদিকাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে সাধ্যমতো ভালো খাবার পরিবেশনের চল ছিল। এদিন বাঙালি চিরকালই ভালো খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতো।

ভয়াশ্রমে ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস সব ধরনের মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সরবরাহ তো আর পুরোপুরি বন্ধ থাকে না। তাই শহুরে পান্তা ইলিশ পরিবেশনে ইলিশের জোগান দিতে মাঘ মাস থেকেই ব্যবসায়ী ও মজুতদারেরা হিমাগারের বরফে ইলিশ সংরক্ষণ শুরু হয়।এ প্রেক্ষিতে বলা যায় পান্তা ইলিশ যতখানি না বাঙালি সংস্কৃতির দাবীদার তারচেয়েও ব্যবসায়িক বুদ্ধির চমৎকৃত ফসল। তবে ব্যতিক্রম পান্তা। নববর্ষের আগের দিন তথা চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বাঙালি খেতো শাক-ভাত তথা শাকান্ন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকাল বেলাতেই বাড়ির চারপাশের জলা, জংলা, ঝোপঝাড় থেকে শাক তুলে আনতো বাড়ির বউ-ঝিরা। মজার ব্যাপার হলো এই শাক হতে হত অনাবাদী। এমন চৌদ্দ পদের শাক দিয়েই চৈত্র সংক্রান্তির দিনের দুপুরের আহার হত। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শাকান্ন ছাড়া বাড়িতে কোনো মাছ মাংসের পদ রান্না হত না।

এবার আসি ইলিশ মাছের কথায় -
ইলিশ ডিম পাড়ার জন্য সমুদ্র থেকে দূরবর্তী নদীর জলে চলে আসে বছরের দুটো সময়ে - মার্চ, এপ্রিল এবং জুলাই, সেপ্টেম্বরে।
আন্তর্জাতিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের সূত্র ধরে দেখা যায়, ইলিশ মাছের বিচরণ ক্ষেত্র ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালেশিয়া, ইরান এবং আরও কিছু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী জলে। কিন্তু এরা প্রজননের সময়ে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর বহমান জলে চলে আসে এবং এখানেই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রজনন হয়। মা ইলিশ ভরা বর্ষার সময়ে জলে ডিম পাড়ে। নদীর জলের ১২০০-১৩০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে এদের বিচরণ ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে ইলিশ মাছের স্বাদ আরও সুস্বাদু হয় যখন এরা সমুদ্রের লোনা জলের লবণাক্ত ভাব কাটিয়ে নদীর জলে অবগাহন করে।

তথ্যসূত্র -

১.বাংলা নববর্ষে যেভাবে সংযুক্ত হয়েছিল পান্তা ও ইলিশ
আহমাদ ইশতিয়াক (ডেইলি স্টার বাংলা)
২. অন্তর্জালের নানান খবর

-অতনু দাশ গুপ্তা

মানুষ

-মদন মোহন সামন্ত (কলকাতা)

একটু কষ্ট করে খুঁড়লে পেতেও পার
একটা বড় সভ্যতা।
নিখুঁত জ্যামিতিক বিন্যাসে ঘরবাড়ি
পরিচ্ছন্ন উঠোন
অপূর্ব সব আলপনা।
পরিপাটি গৃহস্থালি - আপাত অগোছালো ভাব উধাও।

একটু মান্যি করলে দেখবে
তার মেটামরফোসিস -
বিস্তৃত ডাল পালায় প্রকান্ড মহীরুহ
পাখ পাখালি সরীসৃপের নিশ্চিন্ত আস্তানা।
দায়িত্বহীনতার লেশমাত্রও নেই।

যদি ভরসা করো
তুমুল উৎসাহে বিন্ধপর্বত মাথায় নিয়ে নাচবে
নিশ্চিন্ত আর্দশ নিদ্রার অবকাশ পাবে তুমি।
আর যদি ভালবাসতে পারো ঠিকঠাক
তাহলে তো কথাই নেই।
তার সাতসমুদ্র তের নদীর পৃথিবীটাকে
আস্তে তুলে দেবে তোমার হাতে।
আর নিজে -
নিঃস্তব্ধতায় পূর্ণতা নেবে জীবনের।

কাঁঠাল গাছের গল্প

চৌধুরী দা'র এক চোখে তাকানোটা বড় অন্তর্ভেদী। খুব তাড়াতাড়ি বেশ আপনজন হয়ে উঠেছিলেন ঐ আবাসনে বসবাসকারী অনেক পরিবারেরই। ওনার আরেকটা চোখ বেশ ছোটবেলায়, যখন সবে ডানপিটে হয়ে উঠছেন, তখন এক আদিবাসী বন্ধুর, তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে না বুঝেই এক ভয়ংকর খেলায় মেতেছিলেন, আর তাতেই হারিয়ে গেছিল চোখের দৃষ্টি।

বাঁকুড়ার ওন্দার পিংরুই গ্রামে বেশ ভালোই জমিজমা আছে ওনাদের। "দ্বারকেশর নদীর ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে কত পথই চলে যেতাম" খুব স্পষ্ট উচ্চারণে সুবক্তা ছিলেন চৌধুরী দা। ছোটবেলার গল্প করতে করতে নিজেই হারিয়ে যেতেন ছোটবেলায়।

‘বাঁকুড়া মল্লভূম রাজাদের রাজধানী ছিল। এক সময়ে বাংলার মসনদ যারা বীরবিক্রমে শাসন করেছেন। বর্তমানে টেরাকোটার মূর্তির জন্য বেশ বিখ্যাত পর্যটকদের কাছে। ওখানকার মাটির রং লাল আর ঐ লাল মাটি দিয়েই বানানো হয় মূর্তিগুলো। তারপর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্বে বর্ধমান জেলা, দক্ষিণপূর্বে হুগলি দক্ষিণ পশ্চিমে মেদিনীপুর আর পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা। ওখানকার বিখ্যাত পাহাড় বিহারীনাথ ৪৪৮ মিটার, ১৪৭০ ফুট। শুশুনিয়াও দারুণ উচ্চতার।‘ সুস্পষ্ট উচ্চারণে এমন বলে যেতেন উনি, মুগ্ধ হতাম সকলেই। নদী নালা, পাহাড় পর্বতের গল্পগুলো এমন ভাবে বর্ণনা করতেন, একটা ছবি আঁকা হয়ে যেত মনের মধ্যে। অনেক নদীর মধ্যে দ্বারকেশ্বর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর অবশ্য অনেক শাখানদীও বেরিয়েছে। অনেক সময় নিয়ে ভারী সুন্দর করে বলে যেতেন উনি। চোখের সামনে যেন দেখতে পেতাম সব।

এরকমই একদিন দৌড়চ্ছেন কৈশোরে, বন্ধু বীরসার সাথে,দ্বারকেশ্বরের গা ঘেঁষে, হাতে তীর, ফলায় লাগানো বিষ, বীরসা আগে উনি পেছনে; হঠাৎই বীরসা পেছন ফিরে একটা বুনো হাঁসকে তাক করে তীর ছুড়লো আর কীরকম ভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওর চোখো এসে লাগলো তীরটা। বীরসা নিজেও হতবাক। দৌড়ে এসে নিজে ওর চোখ ধুয়ে নদীর জল দিয়ে বারবার শ্রশ্রুষা করতে লাগলো। কিন্তু বিধাতার লেখন, বিষাক্ত তীরের ফলার আঘাতে চোখ ফুলে ওঠেছিল। বীরসা কাঁদো কাঁদো মুখে রোজ আসত, বসে থাকতো আর ঘাড় নাড়তো বারবার। কথা কম বলার অভ্যাস ছিল ওর। শরীরী ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইতো, এটা ও করতেই চায়নি। ওন্দার পিংরুই থেকে বাঁকুড়া সদর, তারপর কলকাতা। ডান চোখটা তুলে ফেলতে হয়েছিল। আবার পাথরের চোখও সহ্য হয়নি। তাই এক চোখেই দেখতেন উনি। কিন্তু সেই একটা চোখের দৃষ্টি ছিল একেবারে অন্তর্ভেদী।

তারপর কলকাতাতেই থেকে যান অভিভাবকদের সিদ্ধান্তে। স্বাভাবিকভাবেই বীরসার সাথে যোগাযোগটাও ছিন্ন হয়ে যায়।
এরপর একের পর এক চৌধুরী দার জীবনে সাফল্য আসতে থাকে। যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভাগে চাকরিও হয়ে যায় আর তারপরই জীবনে আসে সুজাতা দি।

যখন গ্রামে যেতেন, বীরসা আসত দেখা করতে প্রত্যেকবারই। সেই একই আবেশ বীরসার কথা কম বলতো বারবারই। একবার গরমের মাঝামাঝি সময়ে চৌধুরী দা বাড়ি গেলেন। তখন কাঁঠাল পাক ধরেছে। বীরসা ওদের বাড়ির একটা গাছ পাকা কাঁঠাল চৌধুরী দাকে এসে দিয়ে গেল। জীবনে অনেক কাঁঠাল খেয়েছেন উনি, কিন্তু এরকম স্বাদু কাঁঠাল যেন কখনও খাননি। বীরসাকে জিজ্ঞেস করলেন – "আগে তো কখনও এই গাছের কাঁঠাল খাইনি।" জবাবে বীরসা জানালো, গাছটা মাত্র দুবছর হল ফল ধরেছে আর এই দুই বছরে চৌধুরী দা একবারও কাঁঠালের সময়ে যাননি।

স্বভাবতই অফিসের সহকর্মীদের একরম কাঁঠাল খাওয়ানোর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন চৌধুরী দা। বীরসা যেন গলে পাঁক! যেন ধন্য হয়ে গেল। সুদূর ওন্দার পিংরুই থেকে অত ভারী কাঁঠাল কেমন করে বয়ে আনবেন চৌধুরী দা, এই ভাবনায় বীরসা খুব চিন্তিত। চৌধুরী দা প্রবল ইচ্ছের কাছে কোনটাই প্রতিবন্ধকতা হলো না তখন। সেই কাঁঠাল বয়ে এনে অফিসের সকলকে খাইয়ে, তাদের চোখে মুখের তৃপ্তির অভিব্যক্তিতে চৌধুরী দা এক অপার্থিব আনন্দে ভরে গেলেন।

" না, এরকম স্বাদের কাঁঠাল কোনদিন খাইনি!" আর প্রস্তাব দিল- পাকা দানা দু'চারটে এই পুঁতে দিলে কেমন হয়। অফিসটা এখন টালিগঞ্জের ট্রাম ডিপোর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীজীবিদের কোয়ার্টারের একতলায়। অনেকটাই মাটি সামনে। আর সেই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল অতি উৎসাহে বেশ কয়েকটা দানা। গাছও বের হল সময় মতো। একদিন তাতে ফলও ধরলো একেবারে নিচ থেকে। বীজ থেকে গাছ আবার তাতে ফল। চৌধুরী দার সন্তান, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার অনুভূতি। বারবার বীরসার খুশিতে আপ্লুত মুখটা মনে পড়েছিল চৌধুরীদার। আর কী-ই অদ্ভুত! সেই একরকম স্বাদ! সবাই খেয়ে খুব খুশী।

ইতিমধ্যে চৌধুরী দার অফিস বদলী হয়ে কুঁদ ঘাটের সেন্টারে চলে এসেছিল। পরের বছর তখনও এঁচোড়, গাছভরতি, কোন এক অফিসিয়াল কারণে ঐ অফিসে গিয়েছিলেন তিনি। ফলভর্তি গাছ যেন ওনাকে পিতাপুত্রের অনুভূত করালো। "কাঁঠাল পাকলেই খবর পাঠাবো। আসবেন দাদা। একসাথে সকলে কাঁঠালভাতি করবো। এক মুখ হেসে চৌধুরী দার উত্তর - অবশ্যই। মনে মনে ভাবলেন এখনও মাসখানেক সময় লাগবে। সপ্তাহ তিনেক পরে হঠাৎই ফোন। কোন এক কোয়ার্টারের অধিবাসীর।
কি কান্ড এসব?
মানে? কি কান্ড?
সবার সন্দেহের তীর তো আপনার দিকেই।
কেন?
নীচ থেকে উপর পর্যন্ত একটা কাঁঠালও তো নেই!
আপনিই তো গাছটার সূচনা।
মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো চৌধুরী দার। উনি কোন সুদূর থেকে কী কষ্টেই না বয়ে এনেছিলেন কাঁঠাল টা। সবাইকে স্বাদে বিমোহিত করে দেবেন বলে। তার এই কদর্য মূল্যায়ন!
পারলেন না বাড়িতে বসে থাকলে আর। চলে গেলেন টালিগঞ্জের অফিসে। গাছটাকে দেখে ভেতরটা দুমড়ে উঠলো। অফিসে সহকারীদের কেউ কোন কথা বললো না। না আবাহন না বিসর্জন।
গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন চৌধুরী দা। অপমানে, বেদনায় চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গাছটার দিকে। সেই অর্ন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে। চোখের জল পড়তে লাগলো গাছের গোড়াতেও।

গাছটা আজও আছে। যথাসময়ে কুঁড়ি আসে। কিন্তু এঁচোড় হয়ে ওঠার আগে সব ঝরে যায়।

-দিপিলা সামন্ত (কলকাতা)

প্রকৃতি

কলমে: ঈশিতা রায় (USA)

প্রকৃতি আমায় বড্ড টানে,
ভাসিয়ে গা তার উজানে,
মাখতে চাই রঙিন আভা
সে যে বড়োই মনোলোভা।

ছুটে যাই সাগর পানে,
জলকেলি করি ঢেউ এর মাঝে,
ভাসবো আমি দেশে বিদেশে,
পৌঁছব কোন এক অচিন তটে।

পাহাড় চুড়োয় উঠে আমি,
ছোঁব নীল আকাশ টাকে,
পৃথিবী টাকে মুঠোয় নেব
না হয় একদিনের ই রাজা হবো।।

বৃষ্টি হাঁকে তার ইশারায়
ভিজবো আমি অঝোর ধারায়,
মেঘের সাথে করবো আড়ি
গর্জায় সে বড্ড ভারী।

শ্যামল বনানী ডাকে আমায়
শ্রান্ত হয়ে তরুছায়ায়,
শিশির স্নাত হয়ে আমি
নিদ্রা যাবো তৃণশয্যায়।।

পাখির কুজন অলিগুঞ্জন
সৃষ্টি করবে অনুরণন,
ফুলের সুবাস পাতার দোলা,
জাগাবে আমায় দিয়ে ঠেলা।।

ধন্য তব এই প্রকৃতি,
ধন্য তব অন্তর্যামী,
সৃষ্টিকর্তা তোমায় জানি
অপরূপ তোমার সৃষ্টি খানি

অপ্রাপ্তির অসুখ

বর্তমান আধুনিক জীবনে নানাবিধ শারীরিক, মানসিক অসুখের সাথে সাথে আরেকটা অসুখ আমাদের অজান্তেই সবাইকে গ্রাস করেছে, তা হলো 'অপ্রাপ্তি'। গাড়ি, বাড়ি, টাকাপয়সা, সৌন্দর্য, চাকরি, সন্তানের প্রতিষ্ঠিত হওয়া - কিছু না কিছু নিয়ে মানুষের মনে সর্বদা এক অপ্রাপ্তির হতাশা। জীবনের এই 'ইঁদুর দৌড়' প্রতিযোগিতা - তে অন্যদের অনুকরণ করতে করতে, অন্যের থেকে নিজেকে আরো বেশি Superior প্রমান করতে করতে এই 'অপ্রাপ্তি' নামক অসুখটা অজান্তেই ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করে। তাই অনেক 'প্রাপ্তি'-র মধ্যেও আমরা 'অপ্রাপ্তি'-কেই দিনের শেষে প্রাধান্য দিই এবং সেটা প্রাপ্ত করার জন্য আরো বেশি মরিয়া হয়ে উঠি, আর ভগবান প্রদত্ত স্বাভাবিক 'প্রাপ্তি'-গুলোকে অনায়াসে পায়ে ঠেলে নিজেকে অসুখী মনে করি।

আমরা কি কখনো ভেবে দেখি, ওই সাইক্লোন, বন্যা বিধস্ত মানুষগুলোর কথা, যারা প্রতিবছর নিজেদের মাথার ছাদ হারায়, আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, নতুন করে সবকিছু শুরু করে; অনাথ আশ্রমের বাবা,মা, আত্মীয় পরিজনহীন বাচ্ছাগুলোর কথা যাদের এই সুবিশাল পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই, যাদের দিন কাটে অবহেলা - লাঞ্ছনায়; বৃদ্ধাশ্রমের বয়স্ক মানুষগুলোর কথা যারা একদিন মুখে রক্ত তুলে সন্তানদের মানুষ করেছিল, আজ সেই সন্তানদের জীবনেই তারা বাড়তি বোঝা। এরাও কিন্তু সবাই আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ। এদেরও আনন্দ, দুঃখ হয়। হয়তোবা ওদের আনন্দটা জীবনে একটু বেশি কারণ ওদের জীবনে চাহিদাটা যে বড্ড সীমিত - ওরা একটা নতুন জামা, একটু খাবার বা একটু সহানুভূতি কিংবা একটু ভালোবাসাতেই সন্তুষ্ট। এটুকুতেই ওদের চোখে মুখে **'পরম প্রাপ্তি'** -র সুখ ফুটে ওঠে।

এই **'অপ্রাপ্তির অসুখ'** ওদের মতো সাধারণ মানুষদের ওপর থাবা বসাতে পারেনা। কাবু করতে পারে আমাদের, যারা সর্বদা ভাবি 'এটা ওরকম হলে ভালো হতো', 'ওর এটা আছে আমার নেই', 'আমাদের থেকে ওরা ভালো আছে' - আরোও যে কত আক্ষেপ। কখনো ভেবে দেখিনা পরমেশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন, তার সিকিভাগ ও হয়তো অনেককে দেননি। আর এই অপাওয়া কে পাওয়ার আশায়, নিজেকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার নেশায় দৌড়োতে দৌড়োতে জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ছোটোখাটো চাওয়া পাওয়া গুলোকে পায়ে পিষে ফেলি। রাতের বেলায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীরটা সোফায় বা বিছানায় এলিয়ে ভাবি - উফফ জীবনে কী পেলাম, শুধু খেটেই চলেছি। কবে যে একটু শান্তি পাবো, কাল সকালে আবার.... ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত দুই চোখ জুড়ে নেমে আসে ঘুম। আবার পরের দিন সকাল শুরু হয় ইঁদুর দৌড় প্রতিযোগিতার আরেকটা নতুন পর্ব নিয়ে। এভাবেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কেটে যায় তবুও **'অপ্রাপ্তির অসুখ'** সারেনা।

তাই আসুন, সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে, ঘুমানোর আগে পাঁচ টা মিনিট অন্তত নিজেকে সময় দিই, আর জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই এই জীবনটা আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

কেমন হয় যদি আমরা এভাবে ভাবতে পারি—

' আমি যেমন, আমি তেমনই সুন্দর, অতুলনীয় '
'আমি যেভাবে আছি, আমি সেভাবেই খুশি'

হয়তো এভাবেই এই **'অপ্রাপ্তির অসুখ'** চিরতরে বিদায় নেবে এবং জীবন হয়ে উঠবে সহজতর।
জীবনে উচ্চাকাঙ্খাও থাকুক, সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাড়নাও থাকুক - তবে তা **'অপ্রাপ্তির আক্ষেপ'** নিয়ে নয়, বরং **'প্রাপ্তির আনন্দ'** নিয়ে।

'Positive Thinking always brings Positive Vibe in our Lives!!!'

-দীপাঞ্জনা ঘোষ

নতুন সকাল

-অনিন্দ্য ব্যানার্জি

শীতের সকাল ধূসর স্মৃতি
মেঘ সাদা আর বরফ মুড়ি,
মেঘলা দুপুর আলসেমিতে
দারুণ শীতের ঘুম চুরি।

সাতসকালের ব্যস্ততাতে
নীল আকাশের হাতছানি,
দিন বদলের ক্লান্তিগুলো
মুছে যাক আজ সব গ্লানি।

নীলাভ ঐ পাখিগুলো আজ
কিসের কথা বলতে চায়?
আমার মনের জানালা বেয়ে
স্মৃতিগুলো আজ হেঁটে যায়।

ফেলে আসা সেই ছোটবেলা
দারুণ দৃপ্ত কাল বেলা।
জীবন পথের কোলাহলে আজ
মন যেন এক রণ-ক্লান্ত কারবালা।

সকাল আসে রাত্রি হয়
মন খারাপের যাত্রীরা
ফেলে আসা মন ভুলে যেতে চায়
অমোঘ মেঘের কালযাত্রীরা।

সাগর ঢেউয়ের দৃপ্ততাতে
নতুন আলো পায় দিশা
কিসের সকাল দেখবো বলে
হার মানে ঐ ক্লান্ত নিশা।

রোদ উঠুক আজ আঙ্গিনাতে
নতুন আলোর জ্যোৎস্না নিয়ে,
যাক ধুয়ে যাক সকল বিবাদ,
শান্ত শীতল ধরণীতে।

সাইকেল কাণ্ড

মাঝে মাঝে আমি আমার কলেজ জীবনের দিন গুলির কথা স্মরণ করি। আমার মনে হয় এই ধরনের স্মৃতিবিধুরতা কমবেশি আপনাদের সকলের হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের চিন্তাবিহ্বল রাজপথে পদচারনা করতে প্রায়ই ইচ্ছা হয় - “আহা, সেই দিন গুলি যদি আর একবার ফিরে পাওয়া যেত!”। সেই ৪-টি বছর এর প্রত্যেকটি দিন যেন অনন্যসুলভ রঙ্গিন, এবং নানাবিধ অপ্রত্যাশিত ও উত্জনাময় ঘটনায় সমৃদ্ধ। আজ আপনাদের সামনে এমনি একটি কৌতুকপূর্ণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরব। আমাদের কলেজটি জলপাইগুড়ি রোড নামক একটি ছোট, অনুন্নত শহরে অবস্থিত। ১১৮-একর জমির উপর বিস্তৃত ক্যাম্পাস, তার মধ্যে বিশাল কলেজ বিল্ডিং, ১টি মহিলা ছাত্রাবাস, ৪টি পুরুষ ছাত্রাবাস, ৪টি ক্যান্টিন, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ প্রভৃতি রয়েছে। কলেজের গেটের সামনে NH-27 রাজ্য সড়ক। ক্যাম্পাস-এর সিমানান্তে রয়েছে তিস্তা নদীর উপকূল এবং চা বাগান। কলেজে ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছিল। প্রত্যেকটা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৬০টি। ছাত্রদের অধিকাংশই থাকত ছাত্রাবাসে। কলেজের বরিষ্ঠ ছাত্রদের উপদ্রব থেকে মুক্তি দেওয়ার স্বার্থে ফার্স্ট-ইয়ার এর পুরুষ ছাত্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ছাত্রাবাস ছিল। ভর্তির পর আমরা ২৫০টি ছেলে সেখানে ঘাঁটি গেড়েছিলাম। অতঃপর, সবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করবার পর এতগুলি ছেলে একসাথে জমায়েত হলে, সেখানে যে কি তুলকালাম লঙ্কাকাণ্ড বাঁধতে পারে, সেটার কল্পনা আমি পাঠক/পাঠিকাদের উপর ছেড়ে দিলাম। মুল কাহিনী শুরু করার আগে বলে রাখি, চরিত্রদের আসল নাম প্রকাশ করছি না। আমাদের প্রত্যেকের হাঁটা-চলাড় ধরন, শরীরের গঠন, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি বিশেষে সবার একটি করে চলতি-নাম বা Nick-Name ছিল। Body-Shaming নামক বস্তুটি কি, তখন আমাদের জানা ছিল না। এই উপাখ্যানে সেই Nick-Name গুলি ব্যবহৃত হবে। আমার রুমমেট ছিল ২-জন। একজনের নাম বাবু। লম্বা চেহারা। একমুখ দাড়ি-গোঁফ। English সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান। আমার আর তার মধ্যে একটি মিল ছিল - আমরা ২-জনেই সাইকেল চালাতে জানতাম না। এই দক্ষতাটির অভাব আমরা ২-জনেই ছাত্রাবাসে থাকাকালীন অনেকবার হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলাম। সেসব দুঃখের কথা আজ থাক। আর একটি রুমমেট-এর নাম হল রতন। বেঁটেখাটো, শ্যামবর্ণ চেহারা। বিশাল চওড়া কপাল। মাথার চুল কোঁকড়ানো। রতন উচ্চমাধ্যমিকে ৯১৮ পেয়েছিল, তাই সে শুরুর দিকে বাকি সবার সাথে বিশেষ ঘ্যাম নিয়ে কথা বলত...যেন সে উচ্চকুলের এক মানব এবং বাকিরা জাতে নিচু। পরে সিনিয়র দের কাছ থেকে "Ragging" নামক একটি ঔষধ খাওয়ার পর তার সেই ভ্রম দুর হয়ে যায়। আমার বাম দিকের ঘরে থাকত ২জন - কুদেব ও মুটকি। কুদেবের মুখে সর্বদায় দুষ্টুমি মাখা হাসি - দেখে মনে হত - এই বুঝি কিছু একটা কাণ্ড ঘটাবে। মুটকি ছিল মোটাসোটা ব্রাহ্মানসন্তান। ছাত্রাবাসে প্রথম রাতে, মশারির দড়ি কম পরায়, নিজের পৈতে দিয়ে সে মশারির দড়ি বানিয়েছিল। তার এই অভিনব বুদ্ধি দেখে আমরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিলাম যে, আগামী ৪ বছরে মুটকিরই একমাত্র যোগ্যতা আছে আসল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। আমার ডান দিকের ঘরটিতে থাকত 2জন - রসগোল্লা ও খেকুটে। রসগোল্লা অমায়িক একটি ছেলে। সর্বদায় মুখে একগাল হাসি। খেকুটের রোগা চেহারা, ভীষণ বদমেজাজি। তাদের সেই ঘর টা ছিল আমাদের আড্ডাখানা। তখনও ইন্টারনেট নামক মহামারি টি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি - তাই সময় কাটানোর জন্য প্রায় সন্ধ্যা বেলা আমরা বাংলা/হিন্দি সিনেমার CD/DVD ভাড়া নিয়ে এসে রসগোল্লার কম্পিউটারে সেগুলি উপভোগ করতাম। সেই আনন্দের কাছে আজকের Netflix-এর Binge-Watching ও হার মানবে।

December মাস এর মাঝামাঝি। আজ প্রথম semester শেষ হয়েছে। সামনে বেশ কয়েকদিন ছুটি। পরীক্ষার পর ছাত্রাবাসে ফিরে, দুপুরের খাবার খেয়ে রসগোল্লাদের ঘরে গেলাম। ঢুকতেই দেখি সেখানে একটি দারুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগেই কিছু “ভাল ছেলে” থাকে... একটু ভাল করে লক্ষ করলেই তাদের চেনা যায় - তেল মাখান মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান, চোখে চশমা, ভাবলেশহীন চাহনি। দেখলাম, সেরকম একটি দল একটি টেবিল দখল করে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে গভীর গবেষণায় মগ্ন। তাঁরা একে-অপরের সাথে গম্ভীর ভাবে প্রশ্নের উত্তর গুলি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে। দেখে মনে হল - আজ বিকেলেই NASA আসছে এদের চাকুরীতে নিযুক্তি দিতে। অপর দিকে খেকুটে নিজের বই গুলি সযত্নে তার খাটের নিচে একটি বাক্সে ভরে রাখছে... এগুলি আবার আগামী Semester-এর পরীক্ষার ঠিক ১৫দিন আগে বের হবে। রসগোল্লা একটি কোলবালিশ নিয়ে জমিদারের মত বসে আছে। পাশেই বাবু, মুটকি, কুদেব ও রতন। ২বছর আগে “ধুম" নামক একটি হিন্দি সিনেমাতে একটি অভিনেতার চুল দেখে রতন মুগ্ধ হয়েছিল, তার ইচ্ছা, সেই অভিনেতার মতন সেও এবার মাথার কোঁকড়ান চুল “straight" করাবে। সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমাকে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টে কুদেব বলল - “আমরা সবাই আজ সিনেমা হলে মুভি দেখতে গেলে কেমন হয়?” শোনামাত্র সবাই রাজি। খেকুটে বলল - “৫টা থেকে শো। আমরা ঠিক ৪:২০ তে হস্টেল থেকে বের হব। ১০মিনিট এ সাইকেল-দার দোকান এ ঢুকব। সেখান থেকে সাইকেল ভাড়া করে আমরা সিনেমা হল-এ যাব।”

এখানে সাইকেল-দা নামক মানুষটির একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। সাইকেল-দার শহরের বাজারে একটি পুরাতন ব্যবসা আছে। কয়েক বছর আগে সেটি হঠাৎ একদিন ফুলে-ফেপে ওঠে, লাভ এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সাইকেল-দার ধারনা জন্মায় - সে এবার টাটা-বিরলার সমকক্ষ হতে চলেছে। সে ঠিক করে, এবার একটি start-up খুলবে। কলেজ ক্যাম্পাস-এ একটু জায়গা ভাড়া নিয়ে সে একটি অভিনব ব্যবসা শুরু করল। ছাত্রদের সর্বদায় বাজারে জেতে হয় - নানারকম জিনিসপত্র কিনতে। কলেজ থেকে বাজার অনেকটাই দুর, এবং রিকশা ভাড়া করার খরচা তো আছেই। সাইকেল-দা ৩০-৪০টা সাইকেল কিনে ছাত্রদের ভাড়া দিতে শুরু করল। ছাত্রাবাস গুলি থেকে ২মিনিট হেঁটে গেলেই সাইকেল-দার দোকান... ঘণ্টায় ২ টাকা ভাড়া। রেজিস্টারে সই করে সাইকেল নাও, আবার কাজ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট ভাড়া মিটিয়ে, সাইকেল ফেরত দিয়ে দাও। সুন্দর ব্যবস্থা ।

বিকেলে যথাসময়ে আমরা সবাই সাইকেল-দার দোকানে হাজির হলাম। আগেই বলেছি, আমি আর বাবু সাইকেল চালাতে পারতাম না। ঠিক হয়েছিল, কুদেব ও মুটকি আমাকে আর বাবু কে সাইকেল-এ “carry-on" করে বসিয়ে নিয়ে যাবে। কুদেবের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখে গদগদ হয়ে বলেছিলাম - “ভাই, আজ তোমার সন্ধ্যার চা-সিগারেট-এর খরচ আমার!”। যাই হোক, বাকিরা সাইকেল নিয়ে এগিয়ে গেছে। একটু পরে কুদেব এবং মুটকি দুজনে দুটো সাইকেল নিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। কুদেব সাইকেল-এর সিটে বসে, সাইকেল-এর সামনের রড টার দিকে ইশারা করে বাবু কে বলল - "আয়, বসে পর”। আর তক্ষুনি ঘটল সেই চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

বাবু এক হাথে সাইকেলের একটা হ্যান্ডল ধরে কুদেবকে আদেশ দিল সাইকেল থেকে নেমে আসতে। তারপর নিজের একটা পা কে সাইকেলের ওপারে নিয়ে গিয়ে, নির্দ্বিধায় সাইকেলের রড এর উপর বসে পরল। তারপর দুহাত দিয়ে সাইকেলের সামনেটা চেপে ধরে, কুদেবকে নির্দেশ দিল, সাইকেলের সিটে বসে পরতে। উদ্দেশ্য - সে ওভাবে রডের ওপর মটরসাইকেল চালানর মতন বসে থাকবে, এবং কুদেব সাইকেলটা চালনা করবে!!

এই ঘটনাটি দেখার পর আমরা বাকি তিনজন কিছুক্ষণের জন্য বাকসংযম হারালাম। কিছুক্ষণ পর আমি মনে-মনে গর্বিত বোধ করলাম এই ভেবে যে - যাক, আমার থেকেও অধম এই পৃথিবীতে আছে, যারা সাইকেলে বসতেও শেখেনি। তারপর কুদেব মাটির দিকে তর্জনী নিক্ষেপ করে বাবুকে বলল - “নেমে আয়!”। কি হয়েছে বুঝতে না পেরে, নিষ্পাপ শিশুর মতন বাবু সাইকেল থেকে নেমে এলো। পরক্ষনেই কুদেব সাইকেলটি হস্তগত করে, প্রাণপণে প্যাডেল মেরে নিমেষের মধ্যে কলেজের গেট পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল। মুটকি ইতিমধ্যে তার সাইকেলে উঠে পরেছে। দেখলাম, বিশালদেহি একটি ব্রাহ্মণসন্তান হতাশামাখা ভঙ্গি তে দুইদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে দিগন্তে অস্তমান সূর্যের দিকে সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে চলেছে।

আজকের এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর মানবজাতির উপর তার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে, এবং সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছে। বলা যায় না, সত্যি হতেও পারে! হিমালয় তো আর আমাদের কলেজ থেকে বেশি দুরে নয়... আমাদের ছাত্রাবাস এর বারান্দা থেকে প্রায় সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘার সূর্যস্নাত স্বর্ণাময় চুরা দেখা যেত।

এতক্ষনে বাবু সাড়া দিল। আমার কাঁধে হাথ রেখে বলল - "চিন্তা করো না! আসলে ওরা মনে হয় বুঝতে পেরেছে যে আমাদেরকে সাইকেলে করে নিয়ে জাওয়া সম্ভব হবে না... দেখছ তো সাইকেলগুলোর অবস্থা... কিরকম লজ্ঝরে!”

হায় ভগবান! সে এখনো বুঝতে পারেনি... যে কি কাণ্ড সে করেছে। আমি কিছু একটা বলতে উদ্যত হলাম...পরক্ষনেই চোখ গেল একটু দুরে। অদূরেই সেই “ভালো ছেলেদের” দলটি দাঁড়িয়ে। সাইকেল ভাড়া নিতে এসে তাঁরা পুরো ব্যাপার টা প্রত্যক্ষ করেছে, এবং এখন অপেক্ষা করে আছে আমাদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। তাদের সেই ভাবলেশহীন চোখমুখ দেখেই আন্দাজ করলাম - আজ রাতের মধ্যেই এই ঘটনা ছাত্রাবাসে "ভাইরাল" হবে, স্বয়ং মহাদেব ও ঠেকাতে পারবেন না! বাবু কে নিয়ে পা চালালাম কলেজ গেটের দিকে। সেদিন আরে সাইকেল চাপা হয়নি। রিচকশা ভাড়া করে বাকিদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম।

এই ঘটনার পর বহু বছর কেটে গেছে। কলেজ-জীবন-এর বন্ধুদের সাথে আর সেরকম যোগাযোগ নেই। আমি “social media" তে অত অ্যাক্টিভ নই। মাঝেমধ্যে বছরে এক-দুবার “whatsapp"-এ দু-চারটে কথা হয়। কয়েকবছর আগে কলকাতা গিয়েছিলাম একটি নিজস্ব কাজে। সেখানে রাস্তায় হঠাৎ কুদেবের সাথে দেখা! বিবাহিত, সস্ত্রীক ছিল। সে এবং তার স্ত্রী আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল একটি রেস্তরাঁয়। কুদেবপত্নি বেশ হাসিখুশি একটি মহিলা। ওয়েটার কে খাবার এর নির্দেশ দেওয়া হলে গল্প শুরু হল। আড্ডা জমে উঠেছিল, এর মাঝে খাবার এলো। খেতে খেতে তার স্ত্রী কে উদ্দেশ্য করে কুদেব আমাকে বলল - “বুঝলে, ওউ কিন্তু তোমার মত সাইকেল চালাতে শেখেনি!”। উত্তরে কি বলব বুঝতে পারলাম না - দুঃখ প্রকাশ করে “আহা রে, কি আর করা যাবে” বলা টা মনে হয় সমীচীন হবে না। কুদেব ততক্ষণে কলেজের সেই সাইকেল কাণ্ড শোনাতে শুরু করে দিয়েছে। গল্প শেষ হলে আমরা আবার নতুন করে হাসলাম। কুদেবপত্নি হাসতে হাসতে কুদেব ক বলল - “আসলে কি বল ত... আমরা না, তোমার মতন ওইসব ছোটখাটো জিনিস, যেমন সাইকেল, স্কুটার, এইসব চালাতে শিখি না। আমরা সোজা 4-wheeler দিয়ে শুরু করি।” খোঁচা টা হজম করে কুদেব বলল - “বেশ ত, 4-wheeler টাই বা কেন শিখলে, সোজা এরোপ্লেন চালান টা শিখলেই ত পারতে!”

-দেবব্রত মন্ডল

১৪৩১ নিচ্ছে বিদায়

শূন্য ঝোলা হাতে।
বিষাদ বদন, ক্লান্ত চরণ
ফিরবে না এই বাংলাতে।
ঝোলায় ভরে এনেছিলো
সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্না,
আজকের দিনে সেসব কথা
হয় ইতিহাসের পাতা।
ও হে বন্ধু ডাকছি তোমায়
একটা কথা শুনে যাও,
যাবার বেলায় মলিনতা যত
ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও।
নতুন বছর আসুক নিয়ে
আনন্দ আর খুশি,
সপরিবারে সুস্থ শরীরে
সকলে থাকুক মিলিমিশি।।
🙏❤️❤️🙏
আসন্ন ১৪৩২ নববর্ষের শুভেচ্ছা

-দীপক এবং জয়শ্রী
(কলকাতা)

Modern People

-Dipanjana Ghosh

Oh! what happened to these people?

Lucrative minds and money is all in all.

What happened to their Humanity?

They really forget, as human beings, their duty

Violence and selfishness are their only concern.

Only in their cyber world they get lot of fun.

They are Detached, Isolated and Unsocial

They really forget the nature, become numbskull

They don't cherish any more the bird's twitter

The sun's beams, green leaves and gentle zephyr.

Their only target is to make Money

And relations or love, all stuffs to them, are really funny.

অঙ্কন এবং আলোকচিত্র

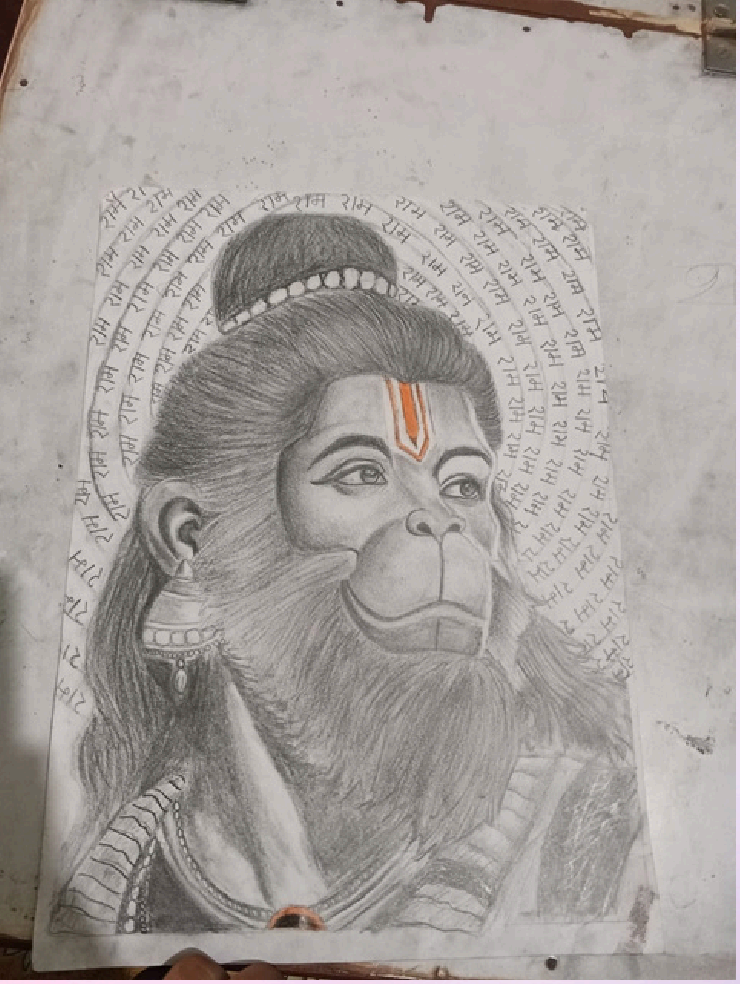

By Nishan Paul
(Kolkata)

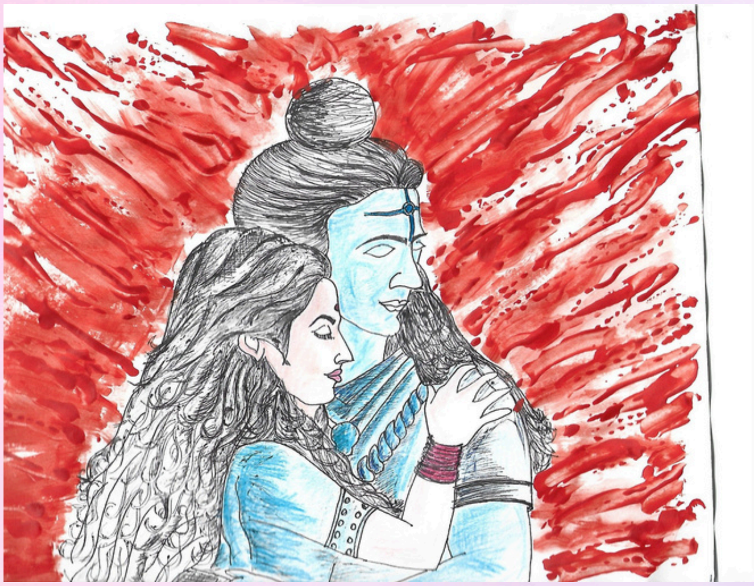

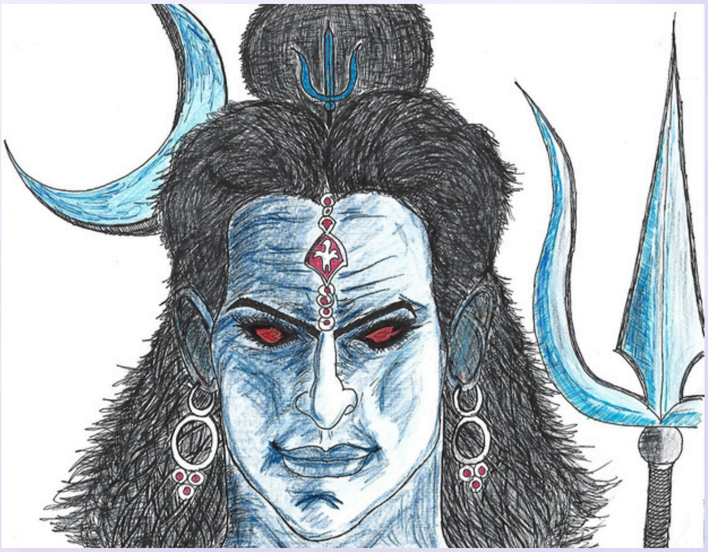

By Kallol Bosu Roy Choudhuri

By Shritan Banerjee (Ruan)

"Trees are the earth's endless effort to speak to the listening heaven"
By Rabindranath Tagore

Captured by- Shamajit Manna

By Anandi Seal (Karnal)

By Prisha Banerjee

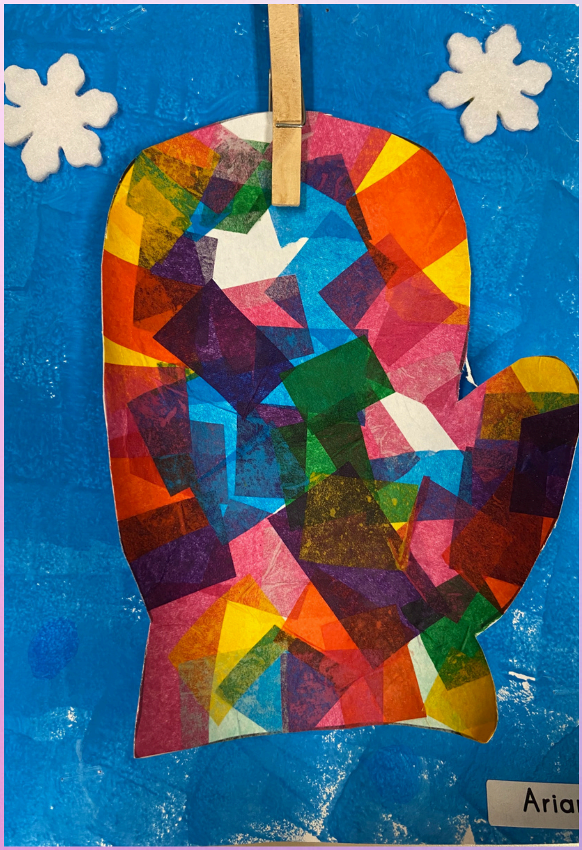

By Ariana Haldar

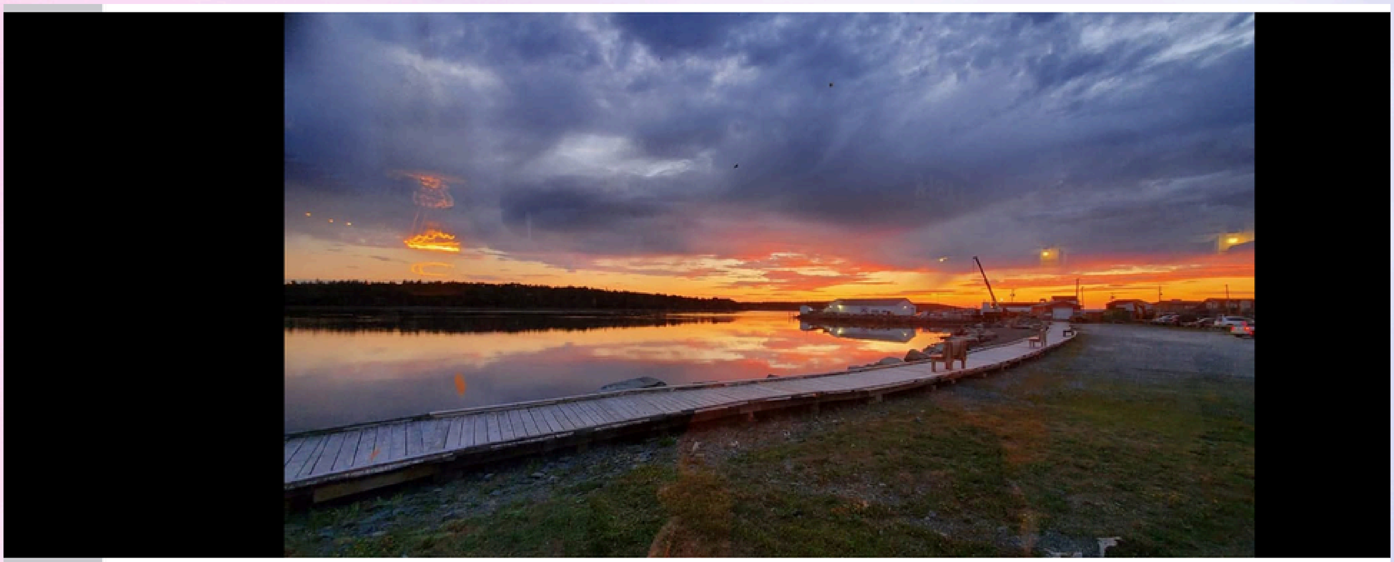

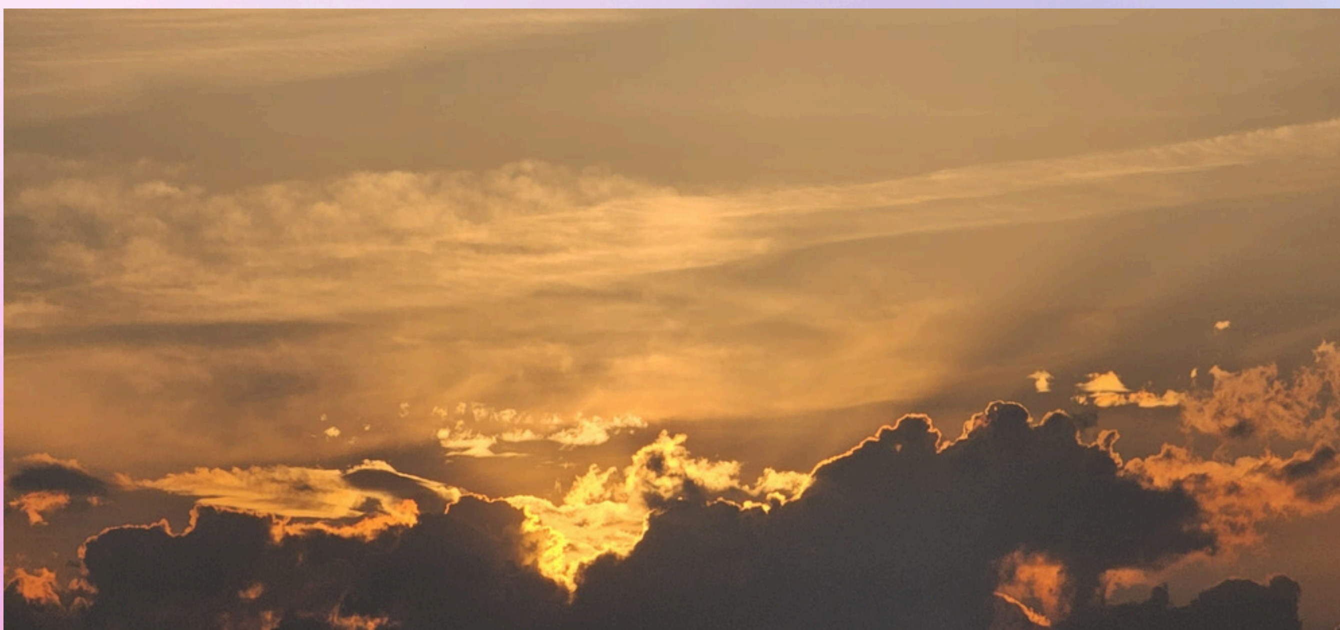

Nature’s Photography
By Amit Chowdhary

By Ridhima Mitra

By Rayaan (Gogo)

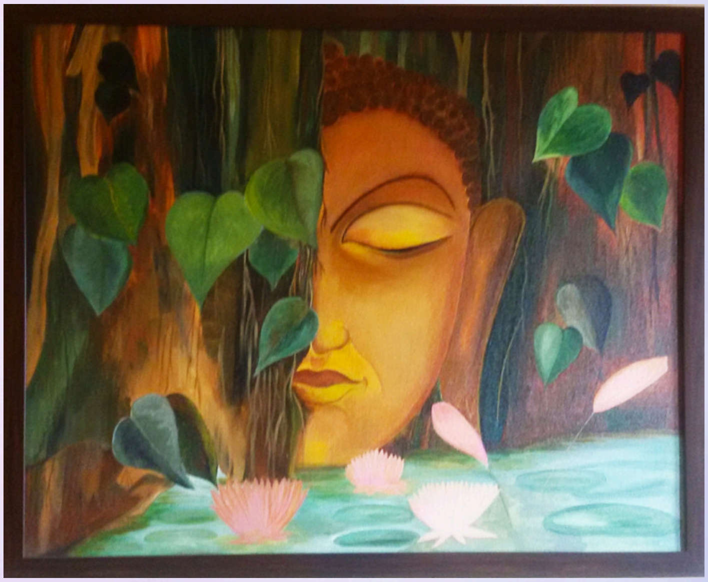

By Mrs. Keya Ghosh
(Kolkata)

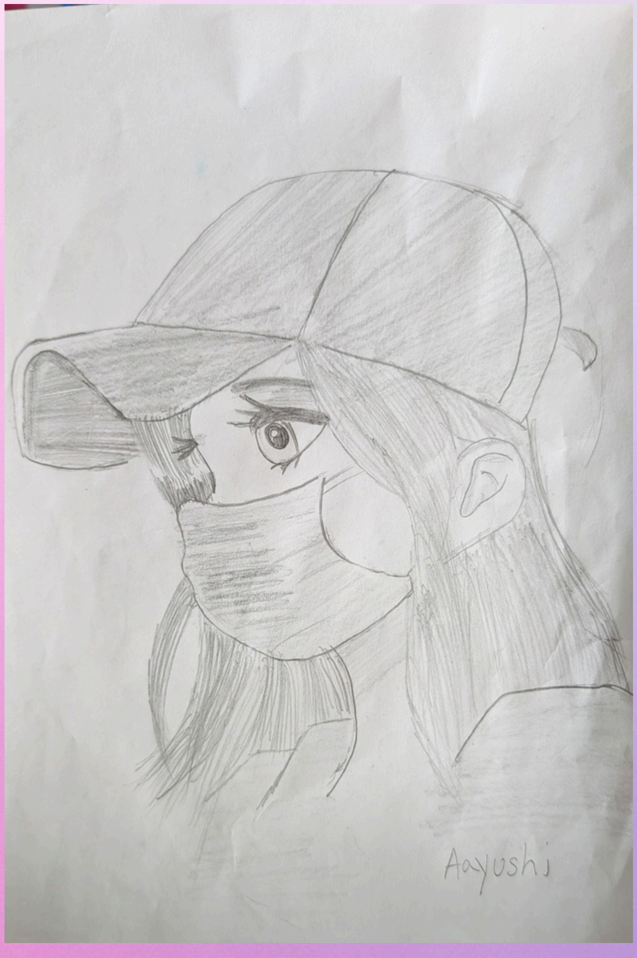

By Aayushi Mondal

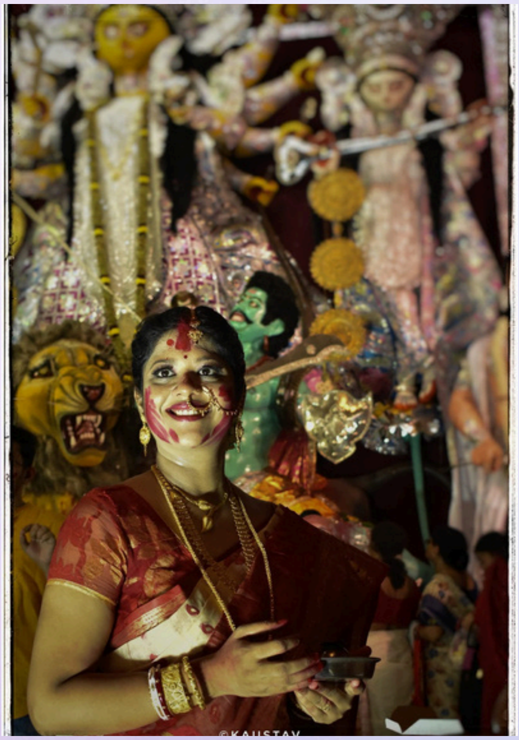

Captured by- Kaustav Roy

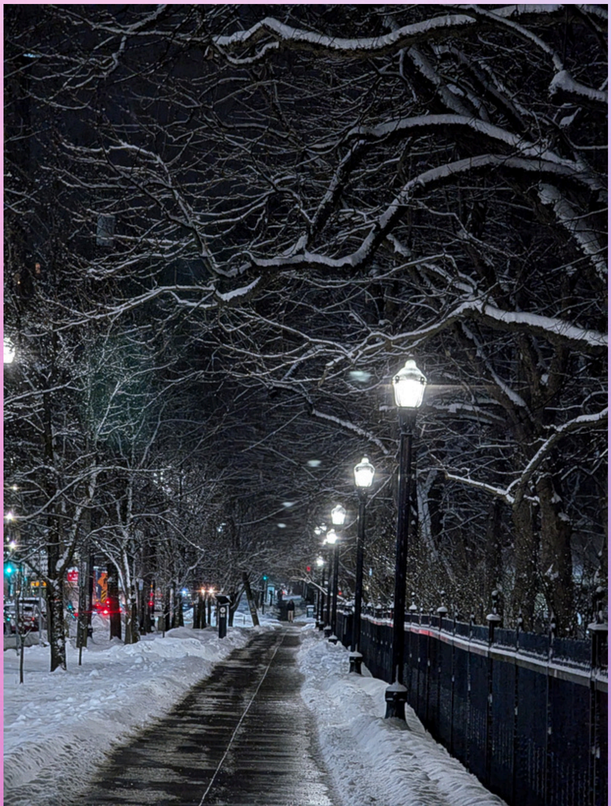

Captured by -
Sourav Ghosh

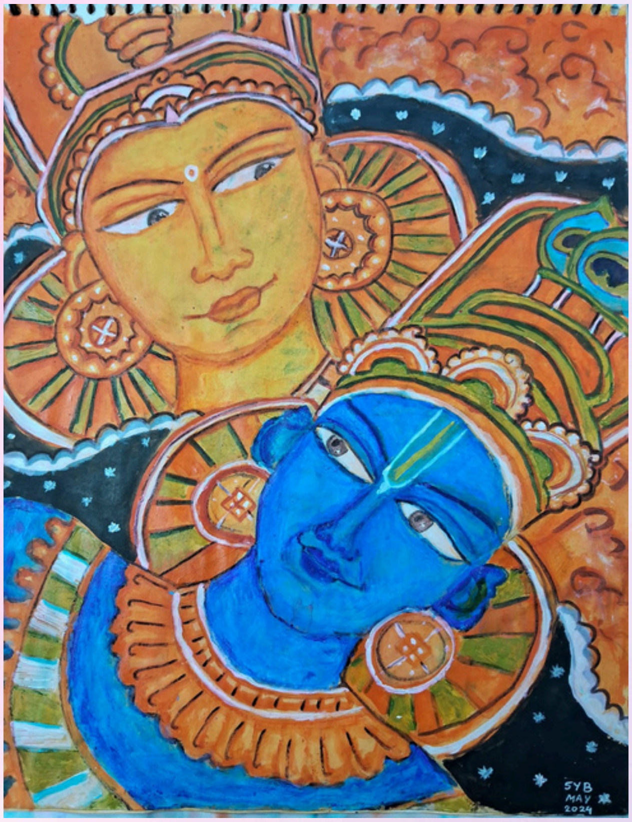

Kerala mural art is a rich and ancient tradition of painting from the state of Kerala. This art form is renowned for its vivid colors, intricate designs, and spiritual themes.

Love for Pet: Dogs are not our whole life, but they make our lives whole..

By Syammantak Bhanja (Jaipur)

POLICE

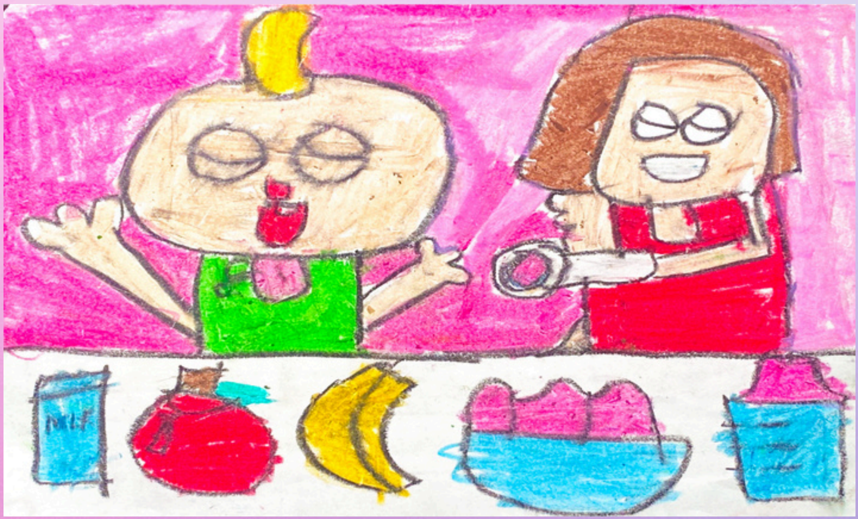

By Aarav Saha

-By Toushini Ghosh
(Yarmouth)

By Ahana Dey

By Nikol Mashtalyar Ray
(Hamilton)

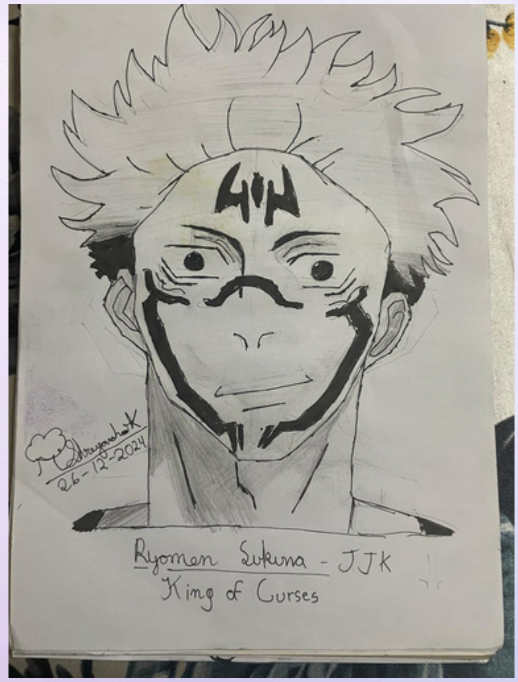

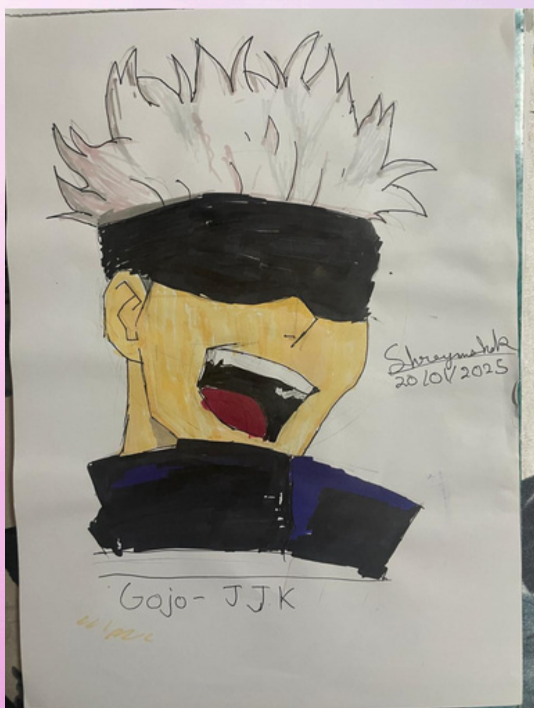

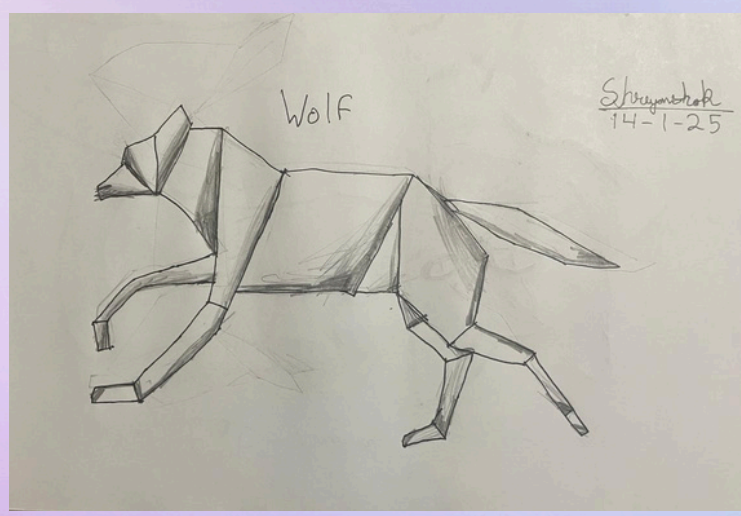

By Shreyansh Kumar (Dubai)

By Rusha Ghosh

By Debabrato Mandal

Some Glimpses of BAAC Events 2025

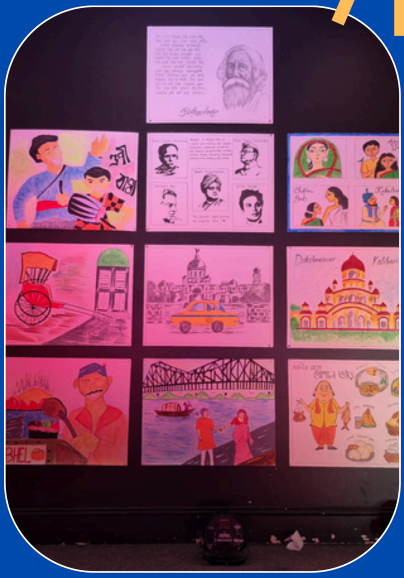

One Beginning, Many Celebrations – A BAAC Winter Welcome to Christmas, New Year & New Beginnings

Together in Prayer, United in Learning – Saraswati Puja with BAAC

Honouring Every Woman's Journey
BAAC Women's Day 2025

Aarohi: A Baisakhi Mahotsav, a Symphony of Spring and Song

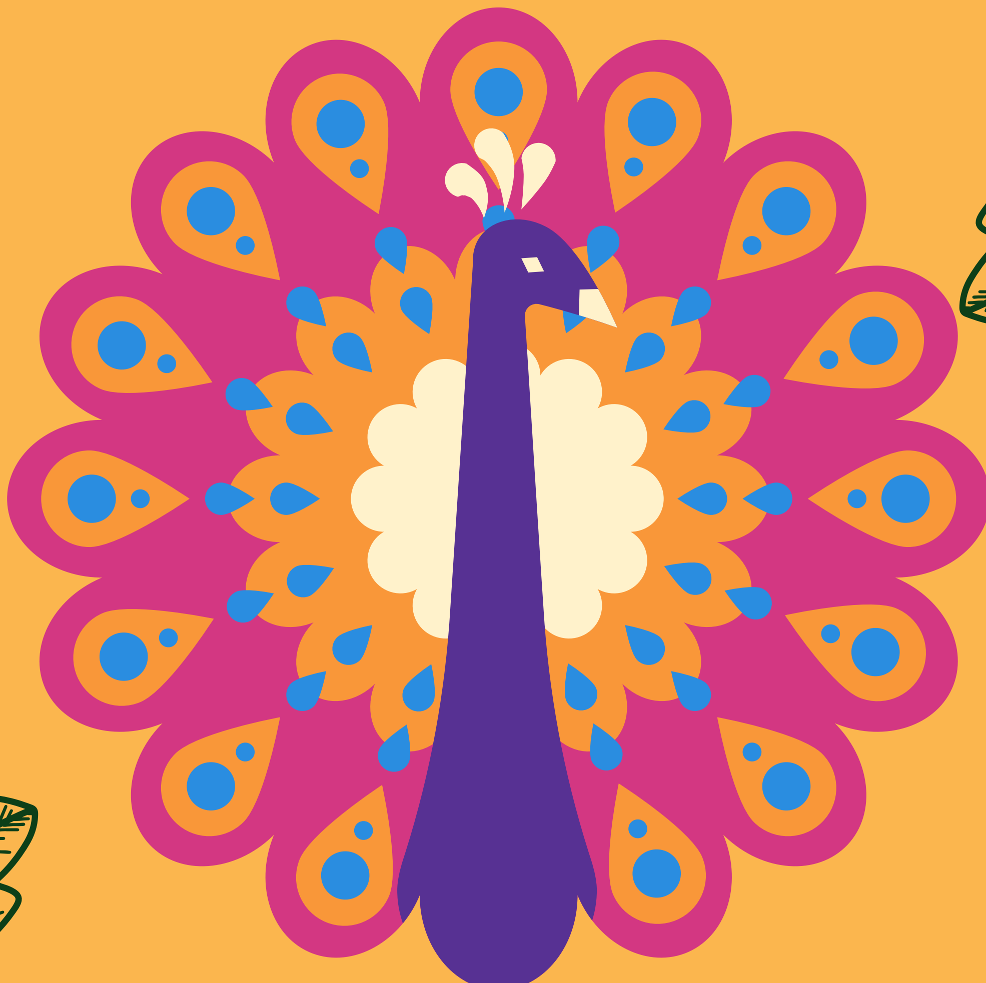

Thank You!